# সাম্যবাদ


বন্যার্ত মানুষের পাশে বাসদ (মার্কসবাদী) ৪

সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্ম অবমাননা-র অভিযোগ প্রসঙ্গে ৩

জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি এবং সিলেটের বন্যা ৮

গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস ও ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে ঢাবি ছাত্র ফ্রন্টের সম্মেলন অনুষ্ঠিত ৫



web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগস্ট, ২০২২ মূল্য ৫ টাকা


## সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক অনুসরণীয় বিপ্লবী চরিত্র

হলভর্তি মানুষের উৎসুক উপস্থিতি। নিচতলায় জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। তাই দ্বিতীয় তলায় গিয়ে বসলেন অনেকেই। এক অসামান্য গভীর ভালোবাসার টানে এত মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন এদেশের অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী, বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রতি। তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভায়।

দিনটি ছিল ১৫ জুলাই ২০২২। বিএমএ অডিটোরিয়ামে ছুটে এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা-কর্মী, সমর্থক এবং দরদী মানুষেরা। ৬ জুলাই মৃত্যুবার্ষিকীর দিন হলেও ঈদের নিকটবর্তী সময় বিবেচনায় ১৫ জুলাই স্মরণসভার তারিখ ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেই তারিখও ঈদের নিকটবর্তী হওয়ায় বিভিন্ন জেলা থেকে অনেকেই অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া ও সড়কের ঝক্কিঝামেলা অতিক্রম করে, অনেক কষ্ট স্বীকার করেই এই স্মরণসভায় এসেছেন। কোনো কোনো জেলার কমরেডদের হয়তো রাতের ঘুমও ঠিকমতো হয়নি। অসুস্থতাকে তুচ্ছ করেও ছুটে এসেছেন কেউ কেউ। মঞ্চের মাঝ বরাবর প্রতিকৃতি দিয়ে নির্মিত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর শ্রদ্ধাঞ্জলি বেদিতে চোখ নিবদ্ধ রেখে অনেকে স্মরণ করেছেন কমরেড হায়দারকে। তাদের ছলছল চোখের চাহনিতে ছিল এক বিপ্লবী যোদ্ধার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা।

স্মরণসভা শুরু হলো ঠিক ৪টায়। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সংগ্রামী জীবনের নানাদিক নিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে একে একে কমরেড হায়দারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দসহ লেখক, বুদ্ধিজীবী ও নানা সংগঠনের প্রতিনিধি।

সভার সভাপতি বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা আলোচকবৃন্দকে সাথে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট হন। তাঁর সভাপতিত্বে এবং জয়দীপ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় সভায় আলোচনা পর্বে যাওয়ার পূর্বে কমরেড মুবিনুল হায়দারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ● ২ এর পাতায় দেখুন

## পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নির্ধারণ, সার্বক্ষণিক বিপ্লবী এবং সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি –এই তিন গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তিনি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন

### – অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী–

*[১৫ জুলাই ২০২২ বিএমএ মিলনায়তনে বাসদ(মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এদেশের অনন্যসাধারণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। অডিও রেকর্ডকৃত বক্তব্যটি কম্পোজ করে এখানে ছাপা হলো।]*

প্রীতিভাজন সভাপতি এবং উপস্থিত বন্ধুগণ,

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আমাদের সকলের বন্ধু ছিলেন। আমারও ব্যক্তিগতভাবে বন্ধু ছিলেন। কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবেও। এবং আমার সুযোগ হয়েছে তার সঙ্গে বিভিন্ন সময় কাজ করার এবং ওই যে নজরুল জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে SUCI যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সেইখানে তাদেরই আমন্ত্রণে মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সাথে আমি গিয়েছিলাম। এবং তাদের কাজকর্ম দেখেছি, তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের কর্মপদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়েছি। এ-কথাটা অন্যরা বলেছেন এখানে, সে কথাটা আমিও বলি। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সম্পর্কে অনেক কথা আমরা বলতে পারব। কিন্তু এককথায় বলতে গেলে বলতে হবে যে, তিনি বিপ্লবী ছিলেন। সার্বক্ষণিক বিপ্লবী ছিলেন। এবং এই বিপ্লবের চিন্তা তাঁকে ধাওয়া করেছে, ওই যে বলা হয় না–কমিউনিজমের প্রেতাত্মা ইউরোপকে ধাওয়া করেছিল একসময়। তেমনি মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে তার বিপরীত প্রেতাত্মা, এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেতাত্মা ধাওয়া করেছিল এবং সেই ভূত তার কাঁধ থেকে কখনো নামেনি। সেই জন্য তাঁর এই বিপ্লবী পরিচয়টাই প্রধান পরিচয়। এবং যারা প্রকৃতই সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন তাদেরকে অবশ্যই বিপ্লবী হতে হবে। এটা আমাদের ● ৪ এর পাতায় দেখুন

## লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন: বিদ্যুৎখাতে লুটপাট ও আমদানি নির্ভর জ্বালানি নীতিই দায়ী

দেশে চলছে ভয়াবহ লোডশেডিং। শিল্প, কৃষি, জনজীবন লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত। সরকারের পক্ষ হতে বলা হয়েছিল, একঘণ্টা পরিকল্পিত লোডশেডিং করা হবে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পরিকল্পনার বদলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। একঘণ্টার লোডশেডিং দেশের অনেক স্থানে নয়-দশ ঘণ্টাতেও দাঁড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের কর্তারা বলেই যাচ্ছেন, আমরাই দেশকে শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছি। কিন্তু, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণেই লোডশেডিং করতে হচ্ছে। কারণ যুদ্ধের কারণে আমদানি করা জ্বালানি তেল-এলএনজির দাম বেড়ে যাওয়ায় ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাতে হয়েছে। অচিরেই সংকট কেটে যাবে। তথ্যমন্ত্রীতো বলেই ফেললেন, অস্ট্রেলিয়াতেও নাকি দিনে ১৭-১৮ ঘন্টা লোডশেডিং হচ্ছে! আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাও তখন কোমড় বেঁধে তা প্রচারে নেমে পড়লেন। যদিও জানা গেল, অস্ট্রেলিয়াতে লোডশেডিং সংক্রান্ত খবরটা বানোয়াট। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের আগে থেকেই বিশ্ববাজারে তেল-এলএনজির দাম ক্রমাগত বাড়ছিলো এবং আরো বাড়ার পূর্বাভাস ছিল। যুদ্ধের ফলে তেল-এলএনজির দাম একলাফে বেড়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল-এলএনজির দাম সবসময়ই অস্থিতিশীল। ফলে আমাদের মতো দেশে আমদানি করা জ্বালানি তেল-এলএনজি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধিতা করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। যেসব দেশে জ্বালানির নিজস্ব কোনো উৎস নেই, তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনে ● ৭ এর পাতায় দেখুন

## ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে রংপুরে ডিসি অফিস ঘেরাও

প্রচলিত আইন সংশোধন করে সিটি কর্পোরেশনের অকৃষি খাস জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, ভোজ্যতেল-চাল-ডাল-আটা-চিনিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের দাম কমানো এবং শ্রমজীবী-গরিব মানুষের জন্য আর্মি রেটে রেশনের দাবিতে রংপুরে ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন-এর উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই ২০২২ ডিসি অফিস ঘেরাও এবং স্থানীয় এমপি ও স্পিকার বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি পালিত হয়। রংপুর প্রেসক্লাব থেকে দুই সহস্রাধিক ভূমিহীন মানুষের বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ডিসি অফিস পৌঁছে ঘেরাও করে। ঘেরাও চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠনের নেতা চানমিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠনের উপদেষ্টা বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সদস্যসচিব আহসানুল আরেফিন তিতু, শফিকুল ইসলাম, মীলা বেগম, রুপানা বেগম, মল্লিকা রানী, পরিতোষ রায়, মিনু বেগম, মো. লিয়ন খান, দুলাল মিয়া, কোহিনুর বেগম, আছিয়া বেগম। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক ● ২ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

# সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে

চৌধুরী, অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সভাপতি মোস্তফা ফারুক।

আলোচকবৃন্দ কমরেড মুবিনুল হায়দারের জীবনসংগ্রামের নানা দিকের প্রতি আলোকপাত করেন এবং এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাঁর মতো বিপ্লবীর কাছ থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে বলে মন্তব্য করেন। তাঁরা এও বলেন যে, এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মতো বিপ্লবী চরিত্র চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

উল্লেখ্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত শরীরে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও চলৎশক্তিহীন হয়ে গত বছর ১৪ মার্চ থেকে চিকিৎসাধীন থেকে ৬ জুলাই ২০২২ তারিখে রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউ-তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। করোনা পরিস্থিতির কারণে তখন সরাসরি স্মরণসভা করা সম্ভব হয়নি। ফলে এবছর সরাসরি স্মরণসভায় সারাদেশ থেকে আগত মানুষদের উপস্থিতি যেমন ছিল চোখে পড়ার মতো, তেমনি তাদের ঔৎসুক্যও প্রমাণ করেছে যে, কমরেড হায়দারের প্রতি তাদের কী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা! কমরেড হায়দারের যথার্থ কমিউনিস্ট বিপ্লবী চরিত্রের অমোঘ টানেই এই মানুষেরা একত্র হয়েছেন।

স্মরণসভায় বক্তব্য চলাকালে দর্শকসারিতে শৃঙ্খলা ছিল অভিভূত করার মতো। গভীর মনোযোগের সাথে দর্শকবৃন্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা শুনেছেন। অডিটোরিয়ামের বহিরাংশে ছিল বুকস্টল এবং কমরেড হায়দারের ছবিসম্বলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনী। সেখানেও কমরেডদের বিচরণ ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতে চট্টগ্রাম জেলার বাড়বকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও কৈশোরেই কলকাতার খিদিরপুরে চাকুরিরত তাঁর এক ভাইয়ের আশ্রয়ে চলে যান। তিনি প্রথাগত বিদ্যালাভের বিশেষ সুযোগ পাননি এবং সাধারণ জীবনযাপন করছিলেন। ইতোপূর্বে ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) বা এসইউসিআই (সি)-কে এক সুকঠিন সংগ্রাম চালিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এবং তারই কার্যক্রম হিসাবে খিদিরপুরে শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। এইসময়ে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ১৯৫১ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর পরিচয় ঘটে। এই ঘটনা কমরেড মুবিনুল হায়দারের জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচনা করে। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী বিশেষীকৃত প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র, শোষিত জনগণের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সকল প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী দল গঠন ও সংগ্রামে অদম্য দৃঢ়তা ও মনোবল, বিরল সাংগঠনিক শক্তি যতটা ঐ বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাতেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করে বিপ্লবী আন্দোলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেন।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে তিনি খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করেছেন, কর্মী সংগ্রহ করেছেন, পার্টি ইউনিট গঠন করেছেন। ওই সময়ে কংগ্রেস সরকারবিরোধী নানা আন্দোলনে তিনি বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর উপরে পুলিশী হামলাও হয়। সরকারি চাকুরিরত ভাই তাতে ভয় পেলে কমরেড মুবিনুল হায়দারকে আশ্রয় ছাড়তে হয়। ওই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জীদের কোনো স্থায়ী আস্তানা ও খাদ্যের সংস্থান ছিল না। কমরেড মুবিনুল হায়দারকেও আশ্রয়চ্যুত হয়ে অনেক দিন অর্ধাহারে-অনাহারে কলকাতার পার্কে-ফুটপাতে রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত এই সংগ্রামী মানুষটি শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৬৪ সালে ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উদ্বিগ্ন হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করার জন্য কমরেড মুবিনুল হায়দারকে দায়িত্ব দেন এবং বহু প্রদেশ ঘুরে খুবই যোগ্যতার সাথে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কলকাতায় তাঁরই উদ্যোগে এক বিশাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওই দলের সংগ্রামী যুব সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইশেন' (এআইডিওয়াইও) গড়ে ওঠে, যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার। ১৯৬৭ সালে তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হয় এবং তিনি দিল্লি ও হরিয়ানায় এসইউসিআই (সি)-এর সংগঠন গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য যে, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে থেকে এবং জ্ঞানজগতের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তাঁর অনন্যসাধারণ আলোচনা শুনে কমরেড মুবিনুল হায়দার দর্শন-রাজনীতি-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বহু ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

ইতোমধ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে পার্টির পক্ষ থেকে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি যথার্থ বিপ্লবী দল গঠনের স্বপ্ন নিয়ে স্বদেশে চলে আসেন। মনে রাখতে হবে, সেইসময়ে তিনি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কোনো প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন না, একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। এইসময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন তথা সামাজিক জীবন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছিল। একদিকে বহু শহিদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যবহার করে আপোষকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পাকিস্তানি অত্যাচার-শোষণের পরিবর্তে বাংলাদেশি শোষক-লুটেরাদের শাসন কায়েম করেছে। অন্যদিকে ছাত্র-যুব সমাজ ও জনগণের মধ্যে শোষণমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকৃতি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সঠিক পথ দেখাবার মতো কোনো যথার্থ বিপ্লবী দল ও নেতৃত্ব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা ও অসাধারণ সংগ্রামের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। সেইসময় তাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না, সঙ্গী-সাথী ছিল না, যোগাযোগ ছিল না, থাকা-খাওয়ার সংস্থান ছিল না। অন্যদিকে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ও কমরেড শিবদাস ঘোষও বাংলাদেশে অপরিচিত নাম ছিল। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাসম্বলিত কয়েকটি পুস্তক হাতে নিয়ে তিনি নানাস্থানে ঘুরেছেন, বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী যাঁকেই পেয়েছেন, তাঁকেই এইসব পুস্তক দিয়েছেন, নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন।

এই প্রক্রিয়ায় সদ্য সংগঠিত যৌবনোদ্দীপ্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর অনেক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠক তাঁর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হন। জাসদের কোনো স্তরের সদস্য কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্বে না থাকার পরও ওই দলটির নেতৃত্বের একাংশের উপর তিনি আদর্শগত ছাপ ফেলতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণের মার্কসবাদী বিচারধারা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলোকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল গঠনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত সংগ্রামের শিক্ষা কমরেড মুবিনুল হায়দার যে মাত্রায় জাসদের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে নিয়ে গেছেন। তাঁর সাথে যারা ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাদের বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবী দল গড়ে তোলার আদর্শগত ও সাংগঠনিক সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন জাসদ-এর একদল নেতা-কর্মী। এদেরই একটি অংশ পরবর্তীতে জাসদ নেতৃত্বের হঠকারিতা, আপোষকামিতা, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভ্রান্তির বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

এই নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনি ১৯৮০ সালে 'প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' হিসাবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গড়ে তোলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে নতুন করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামের মূল কেন্দ্র ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলেও তাঁর নাম তখন প্রকাশ করা হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নেতৃত্বে না থাকলেও বাসদ-এর অন্য সকল নেতাদের কাছে তিনি শিক্ষক ও নেতা হিসাবেই গণ্য ছিলেন। সঠিক লাইন ও সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বিপর্যয় ও শোধনবাদের বিকাশ সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়ন, বাংলাদেশের উৎপাদনপদ্ধতি-রাষ্ট্রচরিত্র প্রসঙ্গে অন্যান্য বাম দলের রণনীতি-রণকৌশলের সাথে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা, রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুলসহ শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ, শিক্ষা আন্দোলনে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা, সর্বহারা নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে কর্মীদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা–ইত্যাদি এদেশের বাম রাজনীতিতে বাসদ-এর একটি বিশিষ্ট অবস্থান তৈরি করে। বাসদ কর্তৃক ঘোষিত জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্কসবাদ চর্চার লক্ষ্য নির্ধারণ, 'দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন'–এই চেতনায় সর্বহারা শ্রেণিচেতনার মূর্ত রূপ হিসাবে দলের সাথে ব্যক্তিসত্তাকে একাত্ম করার ধারণা, নেতা-কর্মীদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ গড়ে তোলা, কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম, গণচাঁদার ভিত্তিতে দলের আর্থিক ভিত্তি দাঁড় করানো, ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের স্থলে পার্টি মেস-সেন্টার গড়ে তুলে দলকেন্দ্রিক যৌথজীবনের ধারণা, জনগণের উপর নির্ভরশীল সার্বক্ষণিক কর্মী বা পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যৌথস্বার্থ ও যৌথচেতনাকেন্দ্রিক দলীয় সংস্কৃতি নির্মাণ–এই সকল ধারণা দলে নিয়ে আসা ও চর্চার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

সর্বহারা নৈতিকতা ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে তাঁর জীবন, সংগ্রাম ও আচরণ দলের নেতা-কর্মীদের সামনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে সবসময় ছিল। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করেছেন, সবসময় নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষসহ মার্কসবাদী অথরিটিদের জীবন ও শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-রুচি-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য-সংগীতসহ জ্ঞানজগতের ও জীবনের সকল সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধরানোর জন্য ক্লান্তিহীনভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন। নেতা-কর্মীদের চরিত্রের কাঠামো পাল্টানো ও বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম করেছেন। নিজের হাতে তিনি অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী, সার্বক্ষণিক ক্যাডার ও সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী তৈরি করেছেন।

বাসদ-এর অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যসহ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মূলনীতিগত প্রশ্নে মৌলিক পার্থক্য দেখা দিলে ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল কমরেড মুবিনুল হায়দারকে আহ্বায়ক করে বাসদ-কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি নামে নতুন দল গঠিত হয়, যা পরে কনভেনশনের মাধ্যমে বাসদ (মার্কসবাদী) নাম গ্রহণ করে। আদর্শগত প্রশ্নে পুরনো দলে বাহ্যিক সম্মান-প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ৮০ বছর বয়সে শূন্য হাতে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার ঘটনা কমরেড মুবিনুল হায়দারের দৃঢ় চরিত্র, উচ্চ মনোবল ও গভীর আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক।

নতুন দল গড়ে তোলার সংগ্রাম যখন শুরু হয়, তখন তিনি একের পর এক রোগের আক্রমণে গুরুতর অসুস্থ। ইতোপূর্বে তাঁর হার্টে বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তারপর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় ব্রেনে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, ব্রেনে মাইল্ড স্ট্রোকও হয়। ফলে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে আগের মতো সুস্থ ও সক্ষম ছিলেন না। অন্যদিকে নতুন দলে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠার স্তরে থাকায় অধিকাংশ নেতা ও কর্মী এই প্রক্রিয়ায় চিন্তা করতে ও আলোচনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। তাঁকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করার মতো ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে সক্ষম উপযুক্ত নেতাও গড়ে ওঠেনি, ফলে বহু সিদ্ধান্তই তাঁকে এককভাবে নিতে হয়েছে। এই সংকট কাটানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে পার্টি সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে অতীতের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্টির আদর্শগত ও সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীরও খোলামেলা সমালোচনা হয়, তিনি তা গ্রহণ করেন। এটা তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বের দিক।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশে মার্কসবাদের এক সঠিক উপলব্ধি ও জীবনব্যাপী চর্চার আন্দোলন শুরু হয়, বিপ্লবী রাজনীতিতে উন্নত চরিত্র ও সংস্কৃতি অর্জন যে অপরিহার্য–কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূল্যবান শিক্ষার প্রভাব সৃষ্টি হয়। বহু ছাত্র-যুবক অনুপ্রাণিত হয়, বামপন্থী আন্দোলনে এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। দলের নেতা-কর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল আবেগপূর্ণ, বন্ধুত্বমূলক ও খোলামেলা। তাঁর সংগ্রামী জীবনের নানা শিক্ষা আমাদেরকে বিপ্লবী আন্দোলনে প্রতিনিয়ত পথ দেখাবে।

স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ রানা বলেন, মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে, উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া প্রয়াত নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর যে অপূর্ণ স্বপ্ন তথা বাংলাদেশে যথার্থ শক্তিশালী সাম্যবাদী দল গঠনের সংগ্রাম এবং একইসাথে তীব্রতর শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজ, সেটা আমরা জারি রাখব।

সভাপতির বক্তব্য শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমার পরিবেশনায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

# ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের

কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলার আহ্বায়ক শাহিদুল ইসলাম সুমন, সদস্য জুবায়ের আলম জাহাজী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর মহানগর কমিটির আহ্বায়ক সাজু বাসফোর প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন না করে উল্টো রেলের ধারে, খাসজমিতে যারা কোনরকম মাথা গোঁজার ঠাই করেছে তাদেরকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পুনর্বাসন ছাড়া কোনো বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না। এছাড়া কিছুদিন আগে সরকার ঘোষণা দিয়েছে কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। সরকারের এ ঘোষণা যদি লোকদেখানো না হয় তাহলে তো ভূমিহীনদের দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হল আশ্রয়ের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, যে টুকু আশ্রয় এখন আছে তাও কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, "সকল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবী নিম্নআয়ের মানুষ ভীষণ সংকটে পড়েছে। অবিলম্বে সকল খাদ্যপণ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমাতে হবে এবং আর্মিরেটে রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের সকল ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা না হলে আগামী সংসদ অধিবেশন চলাকালে জাতীয় সংসদ ঘেরাও করা হবে।"

# ইউরিয়া সারের মূল্যবৃদ্ধি

যুক্তি দেখাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষক পর্যায়ে সারের যৌক্তিক ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। কোনো জিনিসের দাম বৃদ্ধি করতে সরকার সবসময় আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দেয়। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে ডিজেলের দাম কম ছিল, তখন কিন্তু দেশের বাজারে দাম কম রাখা হয়নি। সরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেসরকারী বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি দিয়ে তাদের কাছ থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা ও ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। তাহলে জনগুরুত্বসম্পন্ন কৃষি খাতে সার বাবদ প্রদত্ত ভর্তুকি কেন অব্যাহত রাখা যাবে না? সাম্প্রতিক বন্যা-অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বছর বছর ফসলের লাভজনক মূল্য না পেয়ে বিপর্যস্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে যেখানে বিনামূল্যে সার-বীজ-ডিজেল-আর্থিক প্রণোদনা দেয়া দরকার, সেখানে সারের এই মূল্যবৃদ্ধি 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে এসেছে। অন্যদিকে কৃষক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ছিটায় জমিতে, এজন্য সারের ব্যবহার কমাতে দাম বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। তাহলে সরকার নিয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভূমিকা কি কৃষককে সচেতন করার ক্ষেত্রে?"

বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন, "দেশের সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্নে কৃষির জন্য বিগত বছরগুলোর জাতীয় বাজেট ছিল হতাশাজনক। এবারের বাজেটে কৃষিখাতে প্রায় ১০ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা মোট বাজেটের ৪.১২% মাত্র। দেশের জনসংখ্যা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের ৭ কোটি থেকে বর্তমানে সাড়ে ১৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল সংখ্যক জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানে কৃষি খাত ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। তাহলে বাজেটে কেন কৃষকের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকবে না? কৃষকের পৃষ্ঠপোষকতা না করে বরং সারের দাম বৃদ্ধি করা হলো। হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপীদের বিরুদ্ধে সরকার কিছু বলে না। অথচ কৃষকের পাঁচ হাজার টাকা ঋণ আদায়ের জন্য তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় আনা হয়। করোনাকে মোকাবেলা করে গত বছরগুলোতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন করে কৃষকই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তাই কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারী প্রণোদনার ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কৃষি-কৃষককে বাঁচাতে সারের দাম বৃদ্ধি নয়, কৃষককে প্রণোদনা ও কৃষিখাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।"

# হাওরে অপরিকল্পিত সড়ক

কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে পরিচালিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য, সীমা দত্ত।

# সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্ম অবমাননা-র অভিযোগ প্রসঙ্গে

ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টকে কেন্দ্র করে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় দীঘলিয়া গ্রামের সাহা পাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকটি বাড়ি, দোকান ও মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে গত ১৫ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায়। এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ইসলামের নবীকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য সমালোচিত ভারতের বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার সমর্থনে ফেসবুকে নড়াইলের এক হিন্দু কলেজ ছাত্রের পোস্টকে কেন্দ্র করে কলেজ অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় জুতোর মালা পরানোর ঘটনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এর আগে ভারতে বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মা কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের নবী সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য, প্রতিবাদে বিক্ষোভ, এর জেরে সেখানে দুই মুসলমান উগ্রপন্থী কর্তৃক একজন সাধারণ হিন্দু দর্জিকে কুপিয়ে হত্যা করার ঘটনাগুলো সমাজে প্রবল আলোড়ন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গত বছর ১০ বছরে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর, দোকানপাট এবং উপাসনালয়ের ওপর হামলার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে।

যেকোন ধর্ম এবং ধর্মপ্রবর্তক বা সমাজসংস্কারক, যাঁদের প্রতি অগণিত অনুসারীদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা-আবেগ রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপ্রসূত মন্তব্য বা 'হেটস্পীচ' নিশ্চয় নিন্দনীয়। এর প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সবার রয়েছে। পাশাপাশি এধরণের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেলে 'প্রতিশোধ'-এর নামে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হওয়া দরকার মানবতার স্বার্থে। বর্তমানে বিশ্বের যেকোনো দেশে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষ পাশাপাশি বাস করে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সকলের অধিকার সমান। 'বাংলাদেশ ৯০% মুসলমানের দেশ' বা 'ভারত ৮০% হিন্দুর দেশ'–একথা বলে কেউ যদি দাবি করে যে, ইসলাম ধর্মের নিয়মে বাংলাদেশ বা হিন্দু ধর্মের নিয়মে ভারত চলবে, তাহলে সেখানে সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার থাকা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ও সরকার কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য করতে পারে না। এই প্রাথমিক গণতান্ত্রিক নীতিমালা ও মানসিকতার চর্চা, যাকে আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতাশালীদের প্রশ্রয়ে পদদলিত করা হচ্ছে, তাকে রক্ষা ও চর্চার সংগ্রাম বেগবান করতে হলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান ও বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধি দরকার। আমাদের দেশ, ভারত-পাকিস্তানসহ সারা বিশ্বেই বর্তমানে কম-বেশি একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অথচ সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক সহযোগিতা ও অগ্রগতির জন্য চাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের অবসান করে শ্রদ্ধা-সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি, আইনের শাসনের মাধ্যমে সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতা।

### বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার মন্তব্য প্রসঙ্গে

ভারতে ক্ষমতাসীন দল বিজেপি-র জাতীয় দাপ্তরিক মুখপাত্র নূপুর শর্মা গত ২৭ মে একটি টিভি চ্যানেলের টক শো-তে উত্তর প্রদেশের জ্ঞানবাপী মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের দাবি নিয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে আপত্তিকর মন্তব্যটি করেন। মুসলমানদের আক্রমণ ও হেয় করতে গিয়ে তিনি বলেন, '৬ বছরের বাচ্চাকে বিয়ে করে ৯ বছর বয়সে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন নবী'। এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক-এর চরিত্র হনন করতে চেয়েছেন। স্থান-কাল-পরিপ্রেক্ষিতহীনভাবে একটি তথ্যকে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করলে ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তিত্ব বা ঘটনা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে আরবের মধ্যযুগীয় সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ ছিল একটি বাস্তবতা। সেকালে এর জন্য কেউ আপত্তি জানায়নি। ইসলাম ধর্মের নবী তাঁর ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলেন ৪০ বছর বয়সী বিধবা বিবি খাদিজাকে। তাঁর প্রিয় এই স্ত্রীর মৃত্যুর পরই কেবল তিনি পরবর্তী বিয়েগুলো করেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। তৎকালীন রক্তসম্পর্কীয় গোত্রভিত্তিক সমাজে বিয়েগুলোর প্রেক্ষাপট হিসেবে তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদার চাইতেও সেসময়ের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রয়োজন বা আত্মীয়তার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন তাঁর অনুসারীরা। নবীর দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি আয়েশা (বিয়ের সময় অল্পবয়স্কা) ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী হযরত আবু বকরের কন্যা এবং পিতার আগ্রহেই এই বিয়ে হয় বলে উল্লেখ করা হয়। বিবি আয়েশাকে নবী অত্যন্ত ভালোবাসতেন, গুরুত্ব দিতেন, ছোটবেলায় তিনি তাঁকে স্নেহ করে তাঁর সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। নবীকে 'ভোগলিপ্সু' হিসেবে চিত্রিত করলে আরবের সমাজসংস্কারে তাঁর ভূমিকা, তৎকালীন সময়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম তাঁর বড় চরিত্র ও সংগ্রাম-ত্যাগ সম্পর্কে যথার্থ ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

পাশাপাশি মনে রাখতে হবে–সময় ও পরিবেশের সাথে মূল্যবোধও পাল্টায়। আজকের দিনে বেশিরভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহকে নিজেরা চর্চা করেন না বা সমর্থন করেন না। সেসময় দাসপ্রথা অনুমোদিত ছিল, কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ফলে আজকের দিনে দাসপ্রথা মানবাধিকারসম্মত নয়। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক ছিল, আধুনিক যুগে ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-এর ধারণা এসেছে, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-জাতি নির্বিশেষে সকলে সমান অধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক। নিপীড়িত নারী-দরিদ্র ও দাসদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নবী সেসময়ের প্রেক্ষিতে এদের যতটা অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজকের সমাজে তার সীমানা আরও প্রসারিত হয়েছে। সেসময় চুরির জন্য হাত কাটা, গুরুতর অপরাধে শিরচ্ছেদ, ব্যাভিচারীদের পাথর ছুড়ে হত্যার বিধান থাকলেও গত কয়েকশো বছরে অপরাধীর শাস্তি ও সংশোধনের ধারণা অনেক বেশি মানবিক ও আধুনিক হয়েছে, অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে, নূপুর শর্মার বক্তব্যে এই ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতি তো ছিলই, সবচেয়ে বড় কথা তিনি বিজেপি-র মুসলিমবিদ্বেষী রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের কালিমালিপ্ত করতে ও তাদের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে টকশোতে এই মন্তব্য করেছেন। ভালো-মন্দ সব সম্প্রদায়, দেশ বা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই আছে এবং তা পরিবর্তনশীল। 'মুসলিমরা নিষ্ঠুর', 'হিন্দুরা খারাপ', 'কালোরা অপরাধী' বা 'ইহুদিরা লোভী' এধরনের গড় ও অপরিবর্তনীয় ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়, বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়, বরং তা ধর্ম-জাতিবিদ্বেষী বা বর্ণবাদী মানসিকতার জন্ম দেয়।

### বিজেপি-র মুসলিম বিদ্বেষের নির্বাচনী কার্ড ও ভারতে প্রতিক্রিয়া

মুসলিমদের পাশাপাশি নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, সেদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ। যেমন–এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, "বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের দ্বারা নিযুক্ত দলের দুই জাতীয় মুখপাত্র চরম নিন্দনীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন তা তাঁদের ব্যক্তিগতও নয়, আকস্মিকও নয়। এটা জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গায় উস্কানি দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির হীন প্রচেষ্টা। সংঘ পরিবার এবং বিজেপি তাদের নির্বাচনী স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুত্বের 'গৌরবগাথা' প্রচার এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টির যে চেষ্টা চালাচ্ছে এটা তারই ফসল। উপরন্তু এর মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একই সাথে এর দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করে তাদের ইসলামিক মৌলবাদের শিকারে পরিণত করার অপচেষ্টা চলছে, যাতে তা বিজেপি-সংঘ পরিবারের পক্ষে হিন্দু মৌলবাদকে আরও শক্তিশালী করার কাজে সহায়ক হয়। বর্তমানে, যাঁরা এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাচ্ছেন তাঁরা কার্যত বিজেপি-সংঘ পরিবারের এই ষড়যন্ত্রকেই সাহায্য করছেন।" ভারতে ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলমানদের ওপর আক্রমণের ঘটনা বাড়ছে ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর হামলার অনেক ঘটনা ঘটেছে। গরু রক্ষার নামে বেশ কয়েকজন মুসলমানকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির জেরে রাজস্থানের উদয়পুরে কানহাইয়া লাল নামে এক দর্জিকে দুই মুসলিম উগ্রপন্থী হত্যা করেছে গত ২৮ জুন। রাজস্থান পুলিশ এই নৃশংস খুনে অভিযুক্ত মহম্মদ রিয়াজ আখতারি ও মহম্মদ গাউস-কে গ্রেফতার করেছে। কানহাইয়া লাল দিনকয়েক আগে সমাজমাধ্যমে নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের সমর্থনে একটি পোস্ট করেছিলেন। ওই দর্জির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তারও করে। দর্জি অবশ্য জানিয়েছিলেন, তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করতে জানেন না। তার নাবালক ছেলে ভুল করে ওই পোস্ট করে ফেলে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে থানায় ডেকে বিষয়টির মীমাংসার চেষ্টা করে। মুক্তি পান কানহাইয়া। পুলিশি হেফাজত থেকে ফিরে কানহাইয়া ফের নিজের দোকান খুললে সেই দোকানে ঢুকে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। সেই ঘটনার ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে হামলাকারীরা। নূপুর শর্মাকে সমর্থন জানানোর জন্যই তারা একাজ করেছে বলে জানায়। এরপর আরেকটি ভিডিওতে তারা এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে এবং ভারী ছুরি প্রদর্শন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হুমকি দেয়। এছাড়া, নূপুর শর্মার শিরশ্ছেদ করলে নিজের বাড়ি উপহার দিতে চাওয়া আজমীর শরীফ দরগার সালমান চিশতী নামে এক খাদেমকে গ্রেপ্তার করেছে রাজস্থান পুলিশ। ভারতের একাধিক শহরেও সাধারণ মানুষের ওপর আত্মঘাতী হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছে ইসলামী জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা।

### 'ইসলাম বা রাসুল অবমাননা'র শাস্তি দাবি প্রসঙ্গে

এখন, নূপুর শর্মার মন্তব্যের সমালোচনা বা তার মুসলিম বিদ্বেষের বিরোধিতা যে কেউ করতে পারেন। কিন্তু নূপুর শর্মার বক্তব্যের জন্য তার হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা বা ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে নিরীহ হিন্দু দর্জিকে হত্যা করা কি সমর্থন করা যায়? কারো কথায় যদি ইসলামবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েও থাকে, তার জবাব কি পাল্টা হিন্দু বা খ্রিস্টানবিদ্বেষ প্রকাশ করা? নাকি সহনশীলতা ও উন্নত আচরণ দিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করা দরকার? নাহলে তো হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ অনন্তকাল চলতেই থাকবে কোন একপক্ষ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত।

এ বিষয়ে ইসলামী বিধান কী–সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। কোরানে এবং নবীর জীবনে বিভিন্নরকম বক্তব্য ও উদাহরণ পাওয়া যায়। বেশকিছু জায়গায় বলা হয়েছে–কেউ খোদা ও রাসুলের নিন্দা করলে তার সঙ্গ সাময়িকভাবে বর্জন করতে হবে, উপেক্ষা করতে হবে, তাদের প্রত্যুত্তর দেয়া যাবে না। কারণ কারো ধর্ম সম্পর্কে কটু কথা বললে সেও তোমার ধর্ম সম্পর্কে পাল্টা অসম্মানসূচক কথা বলবে। এক্ষেত্রে ধৈর্য্যশীল হতে বলা হয়েছে। নবীর জীবনেই তাঁর সাথে শত্রুতাকারীদের ক্ষমা করার দৃষ্টান্ত আছে। আবার কিছুক্ষেত্রে শত্রুদের প্রতি কঠোর হওয়া ও তাদের সাথে যুদ্ধ করার কথাও বলা হয়েছে। অনেক ইসলামী ধর্মীয় নেতারা বলেন–'শাতিমে রাসুল' বা রাসুল নিন্দাকারীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তবে এ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত বা খলিফা। আবার কিছু ইসলাম ব্যাখ্যাকারীরা বলেন, যেকোন মুসলমানের দায়িত্ব রাসুল বা খোদাদ্রোহীদের হত্যা করা বা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

ইসলামের সহনশীল বা চরমপন্থী বিভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি কতটুকু একজন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিম গ্রহণ বা অনুসরণ করবেন–তা নির্ভর করবে প্রত্যেকের বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা ও চেতনার মানের ওপর। আর মানুষের এই চেতনা অনেকাংশে নির্ভর করে–কোন ধরনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা পরিবেশে সে বাস করে তার ওপর। ধর্মীয় বিতর্কে না গিয়ে আমরা এটুকু বলতে পারি–সামাজিক অগ্রগতির জন্য যা যুক্তিযুক্ত ও মানবকল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, সাধারণভাবে তা-ই গ্রহণ ও চর্চা করা উচিত। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই বিশ্বাস করেন–তাঁর ধর্মই শ্রেষ্ঠ। অনেকসময়ই নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে গিয়ে অন্য ধর্মের সমালোচনা করে এমন মন্তব্য করা হয় যা ওই ধর্মের অনুসারীদের অনুভূতি ও বিশ্বাসকে আহত করতে পারে।

এধরনের প্রতিটি মন্তব্যের জন্য যদি মন্তব্যকারীকে হামলা-মামলা করে শায়েস্তা করা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, তাহলে তো বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সংখ্যালঘু বা ভারতে মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত থাকতে হবে। এরকম অসহিষ্ণুতার পরিবেশে সংখ্যালঘুরা কি স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মচর্চা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মত প্রকাশ করতে পারবেন? না পারলে তাকে কি গণতান্ত্রিক সমাজ বা প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে এমন ব্যবস্থা বলা যায়?

আবার 'ধর্মীয় অনুভূতি আহত হওয়া' বলতে ঠিক কি কি বোঝায়, তার সংজ্ঞাও অনেকক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নয়, অস্পষ্ট বা ছড়ানো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাথে যুক্ত অনেক বিষয়কে চাইলে কেউ 'ধর্ম অবমাননা'-র আওতায় ফেলে দিতে পারেন। যেমন–মধ্যযুগে ইউরোপে বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও বা ব্রুনোর গবেষণা-পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান খ্রীস্টধর্মের বিশ্বাসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় চার্চ-এর বিচারে ব্লাসফেমি বা ধর্মনিন্দার অভিযোগে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড ও গ্যালিলিওর কারাবাসের ঐতিহাসিক ঘটনা আমরা জানি। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যা বিজ্ঞানে প্রমাণিত, তা নিয়ে ক্লাসে বা অন্যত্র আলোচনা করলে একজন মুসলিম বা খ্রীস্টান ধর্মবিশ্বাসী মানুষের 'ধর্মীয় অনুভূতি আহত' হচ্ছে বলে তিনি মনে করতে পারেন। ক্লাসে বিজ্ঞানশিক্ষক বৃষ্টি হওয়ার আবহাওয়াগত কারণ পড়ানোর সময় ধর্মপ্রাণ ছাত্র যদি দাবি করে বসে যে–'মিকাইল ফেরেশতা বৃষ্টি নামান', তাহলে এর সমাধান কী? ফলে ধর্ম হচ্ছে কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা চর্চার বিষয়, এই সীমানা ছাড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিষয় ধর্ম দিয়ে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে নানা জটিলতা তৈরি হবে। শোসকশ্রেণীর স্বার্থে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার সাথে অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামি মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিভাবে 'অন্ধকার যুগ' নামিয়ে এনেছিল–তার উদাহরণ বিশ্ব ইতিহাসে আছে।

আরেকটি বিষয়ও বিবেচনায় রাখা দরকার। ইতিহাস-দর্শন-নৃতত্ত্ব-অর্থনীতি-আইন ইত্যাদি মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিতর্ক-পর্যালোচনা-সমালোচনা হয়, এর মাধ্যমেই জ্ঞানের অগ্রগতি হয়। ধর্ম সমাজবিকাশের ইতিহাসে ও মানুষের মননজগৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দাসসমাজে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলোর উদ্ভবের মাধ্যমে তৎকালীন গোত্রভিত্তিক সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সমাজসংস্কারে ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকরা নির্ধারক অবদান রেখেছেন। আবার পরবর্তীতে শাসকশ্রেণীর শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবেও ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সমাজবিজ্ঞান-ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের বিষয় হিসেবে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ধর্মের ভূমিকা, বিকাশ ইত্যাদি নিয়েও পর্যালোচনা-সমালোচনা হতে পারে। কেউ যদি দাবি করে যে–'জ্ঞানজগতের অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্মের সমালোচনা করা যাবে না, কারণ আমার ধর্মীয় অনুভূতি আহত হতে পারে', তাতে ধর্মবিষয়ক জ্ঞানচর্চার পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

### বাংলাদেশে ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগে ধারাবাহিক হিন্দু ও সংখ্যালঘু নিগ্রহ

নূপুর শর্মার বক্তব্য সমর্থনের অভিযোগ তুলে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজনকে হেনস্থা ও আটক করা হয়েছে। গত ১৮ জুন নড়াইলের মির্জাপুর ইউনাইটেড ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় পুলিশের সামনেই জুতোর মালা পরান আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ ওই কলেজের ছাত্র ও স্থানীয় কিছু ব্যক্তি। সেখানে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সবাই উপস্থিত ছিলেন। অথচ, তিনি ছিলেন নিরপরাধ। তাঁর কলেজের একজন হিন্দু ছাত্রের বিরুদ্ধে ফেসবুকে 'রাসুল অবমাননা'র অভিযোগে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তিনি সবার সাথে আলোচনা করে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেন ওই ছাত্রকে উত্তেজিত জনতার হাতে ছেড়ে দেয়া হল না, 'তিনি হিন্দু বলে তাকে রক্ষা করছেন'–এই অভিযোগে তাঁদের লাঞ্ছিত করা হলো।

গত ২০ মার্চ মুন্সিগঞ্জের বিনোদপুর রামকুমার উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলের ওপর হামলা হলো ক্লাসে ধর্ম অবমাননার নামে। ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তুলে সেটার অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে হৃদয় মণ্ডলকে ফাঁসিয়ে দেয়। উন্মত্ত এলাকাবাসী হামলে পড়ে তাঁর ওপর। পুরো বিষয়টিই ছিল পরিকল্পিত। মারও খেলেন তিনি, মামলাও খেলেন তিনি। ১৯ দিন জেলেও কাটাতে হয়েছে হৃদয় মণ্ডলকে। ২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ এনে স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা করে গ্রামবাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। একপর্যায়ে জনসমক্ষে তাঁকে কান ধরে ওঠবস করান নারায়ণগঞ্জের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান। কিন্তু সত্য জানা গেল শ্যামল কান্তি ভক্তের মুখ থেকে–তাঁকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করতে দীর্ঘদিন ধরে ষড়যন্ত্র ● ৬ এর পাতায় দেখুন

# বন্যার্ত মানুষের পাশে বাসদ (মার্কসবাদী)

সিলেট

সম্প্রতি দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি জেলায় কালের যে ভয়াবহতম বন্যা দেখা দিল, তা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল–রাষ্ট্র ও সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কত উদাসীন। মানুষের মৃত্যু তাদেরকে বিচলিত করেনি, বরং পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঢাকঢোল পেটানোর দিকেই ছিল তাদের সমস্ত মনোযোগ আর অর্থ খরচের তৎপরতা। এটা বন্যার্ত মানুষের জীবনের জন্য ছিল সরকারের চরম অবহেলা। বিপরীত দিকে মানুষই দাঁড়িয়েছে মানুষের বিপদে। বিভিন্ন সংগঠন, পেশাজীবী, স্বেচ্ছাসেবী মানুষেরা বন্যার্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে। শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক দল বাসদ (মার্কসবাদী) রাষ্ট্রের এই দায়িত্বহীনতাকে সাথে সাথে যেমন প্রশ্ন করেছে, তেমনি সময়ক্ষেপণ না করে নিজেদের নেতা-কর্মী, সমর্থক, দরদীদেরকে সাথে নিয়ে বন্যার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। চালিয়েছে ত্রাণ তৎপরতা, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সহায়তার কর্মসূচি। বন্যার্ত

ঢাকা

রৌমারী, কুড়িগ্রাম

মানুষদের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সরাসরি তাদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছে খাবার, পানি ও ওষুধ।

দলের পক্ষ থেকে যখন তহবিল গঠনের জন্য আহ্বান রাখা হয়, তাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের যে আকুতি ও সাড়া পাওয়া গেছে, তা ছিল অভূতপূর্ব। দলের নেতা-কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকরা পথে, পরিবহনে, দোকানে, হাটে-বাজারে, অফিসে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গড়ে তোলে। সকলেরই ছিল একটাই চাওয়া, যেভাবেই হোক বন্যার্ত মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সকলের প্রত্যাশা ও আমাদের উদ্যোগ-দুই মিলে চলতে থাকে ত্রাণ তৎপরতা। যদিও ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের তৎপরতা অপ্রতুল। তবুও সরকার ও রাষ্ট্রের উদাসীনতার বিপরীতে এইটুকু উদ্যোগও মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু। নিজেদের সংকীর্ণ সীমার উর্ধ্বে উঠে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই চেতনাই প্রতিফলিত করেছে–মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।

# পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নির্ধারণ, সার্বক্ষণিক বিপ্লবী এবং সাংস্কৃতিক

অনেকের অভিজ্ঞতা, মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর অভিজ্ঞতা।

যে কথাটা আমরা জানি যে, উঁনি বাংলাদেশের একটি ক্রান্তিকালে এসেছিলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে সুগঠিত করার জন্য। সেই সময়টা একটা অস্থির সময় ছিল, বিভ্রান্তির সময় ছিল এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়েছিল। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের পরিচয়, তাদের নামের মধ্যে যে জাতীয় ছিল সেইটা কোনো আপতিক ঘটনা ছিল না। আসলেই তাদের মধ্যে জাতীয় ব্যাপারটা ছিল। সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তারা তুলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথাও তারা বলেছেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনাটা তো ছিল। জাতীয় ব্যাপারটা নামাতে পারেনি তাদের চিন্তা-চেতনা থেকে। মুবিনুল হায়দার যেটা করলেন সেটা হলো, ওই চিন্তাটাকে সরিয়ে দিয়ে ওটাকে বাদ দিয়ে বাসদ গড়ার প্রক্রিয়ায় তিনি অংশ নিলেন এবং বাসদ গড়ে উঠলো ওই জাতীয়তাবাদকে ত্যাগ করে। জাতীয়তাবাদের যে ভূমিকা তা আমরা জানি, তার ভিত্তিতেই এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পরেই যেটা কর্তব্য ছিল সেটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, তার যে কাজ ছিল তার মধ্যে দিয়ে বাসদকে গঠিত করার মধ্যে দিয়ে তা করেছেন। এবং সেজন্য বাসদ সমাজতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আর থাকেনি।

এবং সেই সময় তিনটি জিনিস আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় – একটা হচ্ছে, এটা তিনি SUCI থেকেই এনেছেন সেটা আমরা জানি। তিনি তাঁর উত্তরাধিকার বহন করেছেন। এই রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল পুঁজিবাদী। এখানে আধা সামন্ত আধা ঔপনিবেশিক এ সমস্ত কথা বলা হয়েছে। ঔপনিবেশিকতা আছে আমরা জানতাম। এবং সামন্তবাদ ভূমিতে না থাকুক, কৃষিতে না থাকুক, অর্থনীতিতে না থাকুক, সংস্কৃতিতে ছিল, সেটাও আমরা জানতাম। কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল পুঁজিবাদী। এই যে ব্রিটিশ রাষ্ট্র, পাকিস্তানি রাষ্ট্র এই অগ্রসরমানতার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই পুঁজিবাদকে চিহ্নিত করা একটা বড় কর্তব্য ছিল সে সময়। এখানের বিপ্লব যে পুঁজিবাদ বিরোধী হবে এবং সেটা যে সমাজতান্ত্রিক হবে–সেই উপলব্ধিটা প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় যে কাজটা তিনি করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে, বিপ্লব হচ্ছে সার্বক্ষণিক কাজ, পেশাদারী কাজ। এই পেশাদারিত্বটা বিপ্লবের ক্ষেত্রে আনতে হবে। এটা কেবল অবসর বিনোদনের কাজ নয়, মাঝে মাঝে করার কাজ নয়। এটা সার্বক্ষণিকভাবে করতে হবে এই ধারণাটা এনেছেন।

আর সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার কাছে মনে হয় যে, বিপ্লবের জন্য সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় এবং সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ভিন্ন বিপ্লব হবে না। বিপ্লব মানে তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়া নয়, বিপ্লব মানে কেবল গুলি খাওয়া নয়, বিপ্লব মানে কেবল অভ্যুত্থান নয়–বিপ্লব মানে পরিবর্তন। এবং সেই পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের পরিবর্তন, সমাজ বিপ্লব। সেই সমাজ বিপ্লবের জন্য যে সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, যে জ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজন, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে জানা প্রয়োজন, যে পূর্ব অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে ধারণ করা প্রয়োজন সেটাকে গুরুত্ব দিতেন মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং তাদের যে দল ঝটঈও তারাও দিত। যে সাংস্কৃতিক কাজটা আমরা SUCI এর মধ্যে দেখেছি, তারা পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, তারা নানান বিষয়ে লিখেছেন, শিবদাস ঘোষের বক্তৃতা-রচনাবলি প্রকাশ করেছেন এবং তারা সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন ছিলেন। ওই যে নজরুল জয়ন্তী তারা উদ্‌যাপন করছিলো। এবং সেই সাংস্কৃতিক জায়গাটা মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বুঝতেন এবং সেইটি তিনি আনার জন্য তৎপরতা করছিলেন। কাজেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নির্ধারণ, সার্বক্ষণিক বিপ্লবী এবং সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি–এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তিনি অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছেন। ওই ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

আমরা এটাও বলব যে SUCI-এর যে কাজটা সেই কাজটার মধ্যে সংস্কৃতি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থে যে, ঝটঈও যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, তারা স্ট্যালিনকে ধারণ করেন, মাও সে তুং-কে ধারণ করেন। কিন্তু ওই চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করতে গেলে স্থানীয় যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং তার মধ্যে যে বিপ্লবী উপাদান আছে তাকে গ্রহণ করতে হবে। এই কাজটা SUCI করেছে। এবং করতে গিয়ে তারা এই ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কী করে সমাজ বিপ্লব করা যায় তা তারা চিন্তা করেছেন। সেই চিন্তাটা তাদের মধ্যে ছিল এবং সেই চিন্তাটাকে মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এখানে নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের দেশে যে বিপ্লবী আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। এখানে আমার বন্ধু হাসান ফকরীর সাথে আমি কথা বলছিলাম। আমরা বলছিলাম যে, আমরা তো বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ছি। কিন্তু বুর্জোয়াদের যে মতাদর্শ তা হলো বিচ্ছিন্নতা, টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, সংকীর্ণ হওয়া। আলাদা হয়ে যাওয়া। এবং ঐ রোগ আমাদের সমাজ বিপ্লবের আন্দোলনের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। সেজন্য আমরা টুকরো টুকরো হচ্ছি, সংকীর্ণ হচ্ছি। বুর্জোয়াদের যেমন পরিবারগুলো পর্যন্ত ভেঙে যাচ্ছে। সেরকম আমাদের দলগুলোও ভেঙে যাচ্ছে। এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জায়গাটায় সংস্কৃতির কথা আসে। আমরা যে আন্দোলন করব তা ওই পুঁজিবাদের যে মতাদর্শ–যে মুনাফালিপ্সা, যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, যে ভোগবাদিতা, সেইগুলোকে উন্মোচিত করে এই সত্য তুলে ধরবে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐক্য ছাড়া বিপ্লব সম্ভবপর নয় এবং সেই ঐক্যের জন্য জ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজন।

সেই কথাটা খুব জরুরি যে, আজকে পুঁজিবাদ নৃশংস। আমরা মনে করি যে, সর্বশেষ জায়গাতে এসে পৌঁছেছে। এই পুজিবাদের যে নৃশংসতা, যে অনৈতিকতা, সেইটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। এই পৃথিবীকে মনুষ্য বসবাসের উপযুক্ত রাখবে না। কাজেই মানুষের সভ্যতা এখন একটা ক্রান্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন কোন দিকে যাবে মানুষ? সেকি আরও পুঁজিবাদের ধারাতেই যাবে, গিয়ে আরও ধ্বংস করবে, নাকি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে? এবং হাজার হাজার বছরের যে ব্যক্তিমালিকানার ইতিহাসকে ত্যাগ করে সামাজিক মালিকানার জায়গায় যেতে হবে। যাবে কি যাবে না সেটা হচ্ছে আজকে বড় প্রশ্ন। এবং সেই জায়গাটার আমরা মুখোমুখি হয়েছি যে, বিপ্লব করতে হলে সামাজিক বিপ্লব করতে হবে। এবং সেই বিপ্লব হচ্ছে এই পুজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করা, তার মূল্যবোধকে-দৃষ্টিভঙ্গীকে-তার আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করা। এবং বিচ্ছিন্নতাকে প্রত্যাখ্যান করা। সংলগ্ন হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আজকে পুঁজিবাদ যে কাজগুলো করছে, আমাদের বাংলাদেশেও করছে। বাম আন্দোলনের মধ্যে যে বিভ্রান্তি যে বিচ্যুতি আমরা দেখি, যারা এককালে বামপন্থী আন্দোলনে শুরু করেছিলেন বিপ্লব করবেন ভেবেছিলেন, তারা যে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, তারা যে অন্য জায়গায় চলে গেছেন, তার বস্তুগত কারণ আছে। বস্তুগত কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক, এখানে কোনো সামাজিক নিশ্চয়তা নেই, জীবিকার তো নেই-ই, জীবনেরও নেই। এক পর্যায়ে গিয়ে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে–এই পুঁজিবাদ দুটো কাজ করে আমরা জানি। একদিকে প্রলোভন দেখায়, অন্যদিকে ভয় দেখায়। আজকে বাংলাদেশে এ যে কত বড় সত্য তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমরা ভয়ের মধ্যে আছি। প্রতিমুহূর্তে ভয়ের মধ্যে আছি, নানান রকমের ভয়। সেই ভয়ের ব্যাখ্যা করে আমি সময় নষ্ট করবো না। কিন্তু আবার ওদিকে প্রলোভনও আছে, সুযোগ আছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সুযোগগুলোকে গ্রহণ করতে গিয়ে এখানে যারা লুণ্ঠনকারী, তারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে দিলো। এবং দরিদ্র বাংলাদেশকে একধরনের উন্নতি দেখালো–সেই উন্নতি শতকরা দশজন লোকের উন্নতি। নব্বই জন সেই উন্নতি থেকে বঞ্চিত। কাজেই এই যে প্রলোভন এবং ভয় সেটা এখন শত্রু।

আরেকটা শত্রু, সেটা হচ্ছে হতাশা। হতাশার চাইতে বড় মারাত্মক ব্যাধি আর হয় না। বিশেষ করে, বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য। মনে হচ্ছে যেন কিছু হবে না, মনে হচ্ছে যেন সম্ভব নয়, মনে হচ্ছে যেন শত্রুপক্ষ অনেক শক্তিশালী। এই যে হতাশাটা দেখা দিয়েছে, সেই হতাশাটা তখনই আসে যখন আপনি একা হয়ে যান। এবং আজকে বাংলাদেশে যে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। দরিদ্র মানুষের আত্মহত্যা পুরোনো। কিন্তু এখন মধ্যবিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সাংবাদিক আত্মহত্যা করছে হতাশার মধ্যে দিয়ে। কী রকম পরিস্থিতি হলে একজন মানুষ আত্মহত্যা করে। অনেক মানুষ আত্মহত্যার প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে এবং সেই আত্মহত্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যদি পাশে কেউ না থাকে, যদি আশা না থাকে, তাহলে আমরা হতাশার মধ্যেই পড়ে যাব। কাজেই আজকে যেটা প্রয়োজন–এই যে বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক প্রত্যাখ্যান আমরা করব, পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করব। তাদের যে পদ্ধতিগুলো, সেগুলো আমরা ত্যাগ করব। কিন্তু আমরা যখন বিপ্লবের জন্য দাঁড়াব, তখন আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যে হতাশাটা আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেই হতাশার জায়গা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। হতাশা থেকে সরে আসার বড় রাস্তা হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কথাগুলো সবাই মনে করছেন যে, আজীবন বিপ্লবী ছিলেন এই অর্থে–কোনো সময়ে, নানান বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন, ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন, সেগুলো আমরা জানি কিন্তু তার মধ্যেও কখনো দেখিনি যে, তিনি মুহূর্তের জন্যও হতাশ হয়েছেন। তাই হতাশার বিরুদ্ধে সংগ্রামও বিপ্লবী সংগ্রাম।

আজকে এই সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা পৃথিবীর সংকট। এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে পুরনো যে জগৎ, পুরোনো যে ব্যক্তিমালিকানার জগৎ–সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু নয় সেটাকে বিধ্বস্ত করে নতুন পৃথিবী গড়তে হবে। সেই পৃথিবী সামাজিক মালিকানার এবং এই সংগ্রামেই আমাদের বন্ধু, আমাদের শিক্ষক মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ছিলেন, তিনি থাকবেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আপনাদের সকলের সঙ্গে মিলে আমিও গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ধন্যবাদ।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্যপণ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবিতে

## বাসদ(মার্কসবাদী)-র গণঅবস্থান

গত ১২ জুন ২০২২ সকাল সাড়ে ১১টায় পল্টন মোড়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়াসহ সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র গণঅবস্থান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করা হয়।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে ও সদস্য সীমা দত্তের পরিচালনায় এই কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়কারী, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা বিধান দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা তসলিমা আক্তার বিউটি, নির্মাণ শ্রমিক ও অটোশ্রমিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের নেতা শহিদুল ইসলাম, পুরান ঢাকার বাসিন্দা মো. কালু মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী।

হবিগঞ্জ | কিশোরগঞ্জ

## সারাদেশে অব্যাহত লোডশেডিং, বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী নীতি, দুর্নীতির জন্য দায়ীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত

# গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস ও ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে ঢাবি ছাত্র ফ্রন্টের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২২ জুন ২০২২ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ত্রয়োদশ সম্মেলন ক্যাম্পাসের বটতলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমার সঞ্চালনায় ও সভাপতি সালমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান এবং ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার।

বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অর্জনকে ব্যয়বহুল করে তোলা ও আসন কমানোর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা সংকোচন, আবাসন সংকট নিরসন না করে শিক্ষার্থীদের জিম্মি করে রাখা, ক্যাম্পাসে দখলদারিত্বের পরিবেশ বজায় রাখা, ইউজিসি'র কৌশলপত্র বাস্তবায়ন, সম্প্রতি সিনেট অধিবেশনে প্রস্তাবিত 'পে একর্ডিং টু অ্যাবিলিটি' প্রভৃতির প্রতিবাদ করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংগ্রামকে অভিবাদন জানান। তারা বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে এবং শাসনক্ষমতায় থাকা সরকার ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। অনুষ্ঠানে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সালমান সিদ্দিকী উচ্চশিক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংকটের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সাদেকুল ইসলাম সাদিককে সভাপতি, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেনকে সহ-সভাপতি, আরাফাত সাদকে সাধারণ সম্পাদক ও মোজাম্মেল হককে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৪ সদস্যের নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন। সম্মেলনের সমাবেশ শেষে বটতলা থেকে দাবি সম্বলিত ফেস্টুন ও পতাকাশোভিত র‍্যালি শুরু হয় এবং মধুর ক্যান্টিন-কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার সামনে এসে শেষ হয়।

*হেলথ সার্ভিস ফোরামের উদ্যোগে সিলেটে বন্যার্ত মানুষের মাঝে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প*

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে সমাবেশ

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নারী শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ কর্তৃক যৌন হেনস্তার শিকার হওয়ার প্রতিবাদে গত ২৪ জুলাই ২০২২ বিকাল ৪টায় শাহবাগে প্রগতিশীল নারী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, নারী অধিকারকর্মীরা এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একের পর এক যৌন হেনস্তার ঘটনা এবং হলের নারীবিদ্বেষী নীতিমালা তৈরির প্রতিবাদে এই সমাবেশ আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অর্ণি আনজুমের সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমল ত্রিপুরা, ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের অর্থ সম্পাদক আরমানুল হক, নারী সংহতির কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য সুমি রেক্সোনা, ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি শিমুল কুন্ডকার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক দিলীপ রায়, চারণ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংগঠক সুস্মিতা রায়, গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার, বিপ্লবী নারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আমেনা আখতার এবং নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত। এছাড়াও সংহতি প্রদান করেছেন সমগীত, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকবৃন্দ।

নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরা হয়:

১. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী ও স্বচ্ছ যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল গঠন করতে হবে।

৩. ছাত্রীদের হলে প্রবেশের ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দেয়া চলবে না।

৪. ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে।

নড়াইলে ঘরবাড়ি, পূজামণ্ডপে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে বাম জোটের সমাবেশ

**সীতাকুণ্ডে স্মার্ট গ্রুপের মালিকাধীন বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ রাসায়নিক বিস্ফোরণে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ**

# নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দাবি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা গত ৫ জুন ২০২২ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সীতাকুণ্ডে স্মার্ট গ্রুপের মালিকানাধীন বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ রাসায়নিক বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত ও শতশত মানুষ আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

তিনি বিবৃতিতে বলেন, "বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহতদের পরিবারের আহাজারি ও আহতদের আর্তনাদে এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়বে। এ মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে বিএম কন্টেইনার ডিপোর মালিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারী তদারকি সংস্থার অবহেলা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে স্পষ্ট উঠে এসেছে। বিএম কন্টেইনার ডিপোর মালিকপক্ষ ডিপোতে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডসহ রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ রাখার বিষয়ে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কোনো অনুমতি নেয়নি। এধরনের রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের কন্টেইনার রাখার জন্য আলাদা বিশেষ অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন, যার ন্যূনতম বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ছিল না। এমনকি আগুন লাগার পর ডিপো কর্তৃপক্ষ ফায়ার ব্রিগেডকেও

দেরিতে খবর দেয় এবং রাসায়নিক দাহ্য পদার্থের উপস্থিতির তথ্য গোপন করে। যে কারণে আগুন নেভাতে গিয়ে বিস্ফোরণে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়া একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এরকম রাসায়নিক পদার্থের কন্টেইনার ডিপো স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার পেছনে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়ও যুক্ত আছে। এ থেকে স্পষ্ট, এটি নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, এর পেছনে বিএম ডিপো মালিক ও কর্তৃপক্ষের মারাত্মক অবহেলাই দায়ী। এজন্য অবহেলাজনিত মৃত্যুর দায়ে অবিলম্বে দায়ী মালিক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ ও আহতদের সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। এ মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে আহতদের সহযোগিতায় যেভাবে সাধারণ মানুষ রক্ত, খাদ্য ও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে যে মহৎ মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সবাইকে নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

সাম্যবাদ

# জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি

দখল হয়ে গেছে। একসময় এ এলাকায় পুকুর-দীঘি মিলিয়ে প্রায় তিন শতাধিক জলাশয় ছিল। এখন টিকে আছে মাত্র ১০-১২টি। বাকীগুলো দখল করা হয়েছে। একথা বুঝতে কষ্ট হয় না; এই দখলদাররা বেশ প্রভাবশালী এবং ক্ষমতার আশেপাশে থাকা শ্রেণী।

হাওরগুলোও দখল আর ভরাট হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন, গত ৩২ বছরে হাওর অঞ্চলের প্রায় সাড়ে ৮৬ শতাংশ ভরাট হয়ে গেছে। এসব ভরাট এবং দখলের সাথে সরকারও জড়িত। সেখানে তৈরি করা হয়েছে স্থাপনা, সরকারি অফিস এবং ক্যান্টনমেন্ট। ফসল রক্ষার নামে হাওড়গুলোতে অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ দেয়া হচ্ছে। এই বাঁধগুলো 'ফলস সেন্স অব সিকিউরিটি' তৈরি করলেও তা ফসল রক্ষায় কার্যকর কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না। বরং বর্ষা মৌসুমে পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে বিঘ্নিত করে মারাত্মক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করছে। কিশোরগঞ্জের ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামে তৈরি করা হয়েছে 'অল ওয়েদার সড়ক'। যা হাওড়ের বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় ভূপ্রকৃতিকে বিবেচনা করে তৈরি হয়নি। রাস্তা নির্মাণের আগে যথাযথ পরিবেশগত সমীক্ষাও চালানো হয়নি।

বৃষ্টি বা বন্যার পানি সাথে সাথেই নেমে যায় না। কিছু সময় প্লাবনভূমি, হাওড় ও নদী অববাহিকায় অবস্থান করে। ভারতের মেঘালয় ও আসাম থেকে নেমে আসা ঢলের পানি সিলেট অঞ্চলের নদী ও হাওড় হয়ে কিশোরগঞ্জের মেঘনা নদীতে মেশে। এ সড়ক পানির স্বাভাবিক গতিপ্রবাহকে রোধ করে এবার মারাত্মক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণায়ন গোটা পৃথিবীকেই ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের কোন স্থান পুড়ে যাচ্ছে খরায়, জ্বলে যাচ্ছে দাবানলে। আবার কোন অঞ্চল ভাসছে অতিবৃষ্টি ও বন্যায়।

পুঁজিবাদী মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা উদগ্র লালসায় শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিকেও শোষণ করছে। মানুষ আর প্রকৃতিকে সহাবস্থানে নয়, দাঁড় করাচ্ছে মুখোমুখি। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে চলছে অধিক কার্বন নিঃসরণ, বনভূমি ধ্বংস, পাহাড় দখল আর হাজারও প্রকৃতি বিধ্বংসী কাণ্ড। পরিবেশগত সংকট প্রত্যক্ষ করে ২৩ বছর বয়সে ১৮৪৩ সালে মার্কস লিখেছিলেন–'পৃথিবীকে ফেরি করার বস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে; যে পৃথিবী আমাদের জন্য রয়েছে কেবল একটাই, আমাদের বেঁচে থাকার যে শর্ত, তাকে ব্যবসার পণ্য করে তুললে আমরা নিজেদের ধ্বংস করার শেষ ধাপে পৌঁছে যাব।'

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতও বেশি হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ বন্যা, পাকিস্তান এবং সাউথ আফ্রিকার অতিবৃষ্টি এর বড় উদাহরণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, সিলেট অঞ্চলের এবারের বন্যার অন্যতম কারণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অতিবৃষ্টি। বাংলাদেশের উজানে ভারতের আসামে এবং সিলেট অঞ্চলে ব্যাপকভাবে গাছ এবং পাহাড় কাটা হচ্ছে। পাহাড়গুলোর পানি শোষণ করতে পারত। পাহাড় কাটার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আবার ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পানির সাথে প্রচুর মাটি আর বালি আসছে।

এটা ঘটছে মেঘালয়ে বৃক্ষনিধনের ফলে ভূমিক্ষয় থেকে। এ প্রক্রিয়ায় সিলেট অঞ্চলের নদীগুলোতে পলি জমছে এবং নাব্যতা হারাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অভিঘাতে সামনের বছরগুলোতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অতিবৃষ্টি এবং বন্যার মাত্রা বাড়বে। কিন্তু সরকারের পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির উদ্যোগ কোথায়?

**বন্যার পানি নেই, দুর্ভোগ আছে**

বন্যার পানি নেমে গেছে। কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে গেছে। অনেকেই আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফিরতে পারছে না। বাড়ি-ঘর যা ছিল তা বন্যায় ভেসে গেছে। ঘরে খাবার নেই। কোনো কাজও হাতে নেই। অথচ জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েই চলেছে। সরকারের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই এই মানুষগুলোকে বাঁচানোর। গৃহপালিত পশু মারা গেছে; ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয়ে গেছে। বানভাসী এ সমস্ত মানুষের কাছে এখন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘর তৈরি বা সংস্কারে এখন তাদের নাভিশ্বাস। এরই মধ্যে এনজিওগুলোর উপদ্রব বেড়েছে; তারা কিস্তির জন্য চাপ দিচ্ছে। এরকম একজন ভুক্তভোগীর ভাষ্য–"খাইয়া বাঁচমু না, কিস্তির টাকা দিমু?"

**ভাসছে মানুষ, সরকার ব্যস্ত আলোকসজ্জায়**

গত ২২ জুন ডেইলি স্টার তাদের এক রিপোর্টে বলছে, সিলেট বিভাগে এখন পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে ২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, ১ হাজার ৯৫২ টন চাল এবং ৩০ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৪ লাখ মানুষের বিপরীতে বরাদ্দ জনপ্রতি ৬ টাকা ৫৫ পয়সা ও ৪৪০ গ্রাম চাল। দিনের পর দিন মানুষ অনাহারে কিংবা শুধু শুকনো খাবার খেয়ে বেঁচে থেকেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে একেবারেই ত্রান পৌঁছেনি।

সরকারী বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে ত্রাণ নিক্ষেপ করে একজনকে নিহত, ১০-১২ জনকে আহত করল। প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টার থেকে একবেলা বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তার দায়িত্ব সারলেন। এবং পুরো সময় ব্যস্ত থাকলেন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন নিয়ে। স্থানীয় মন্ত্রী-এমপিরাও মানুষের পাশে দাঁড়াননি। যেটুকু সহযোগিতা তাও নামকাওয়াস্তে। আমরা দেখলাম, দুর্যোগে মানুষ দাঁড়িয়েছে, মানুষের পাশে; সরকার-রাষ্ট্র নয়।

দু'সপ্তাহ আগেই বন্যার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে তা ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রস্তুতির অভাব ছিল। সরকারের 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র'সহ ১৭টি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর বন্যা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। এদের ভূমিকা 'ঠুঁটো জগন্নাথ'-এর।

বন্যা কবলিত মানুষের অসহায়ত্ব ও সরকারের নির্বিকারত্ব দেখে এ প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক দেশে কোনো দুর্যোগ ঘটলেই সাধারণ জনগণের কাছে হাত পাততে হয় কেন? জনগণ ট্যাক্স দেয় না? ভ্যাট দেয় না? তাহলে জনগণের টাকা যায় কোথায়?

# সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী

করেন। সমাবেশে চারণের ঢাকা নগর সমন্বয়ক সুস্মিতা রায় সুস্তির পরিচালনায় সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কোষাধ্যক্ষ বিমল মজুমদার। সংহতি জানিয়ে গান পরিবেশন করেছেন সমগীতের সাধারণ সম্পাদক বীথি ঘোষসহ তাঁর দল। আরও বক্তব্য রেখেছেন চারণের কেন্দ্রীয় ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা।

সমাবেশ থেকে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাতের উর্ধ্বে উঠে মানুষ পরিচয়কে সমাজ-মননে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় ও সাংস্কৃতিক লড়াই এগিয়ে নিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

# হবিগঞ্জে শ্রমিক কর্মচারী

ও করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার সদস্য অ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশীদ সোয়েব। আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা শাখার আহ্বায়ক মুখলেসুর রহমান, সঞ্চালনা করেন হবিগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা শাখার সদস্য প্রসেনজিৎ রুদ্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জিতু সেন, হৃদয় লোহার, অজিত রায়, তাসলিমা বেগম, পঙ্কজ দাস, হবিগঞ্জ জেলা শাখার জাফর আলী, কাঞ্চন চক্রবর্তী, ময়না রবি দাস, ধনু মিয়া, আব্দুল মজিদ, উজ্জ্বলা পাইনকা, গনি মিয়া, আরব আলী, আব্দুল জব্বার, ফারুক আহমদ। দুপুরের খাবার বিরতির পর সংগীত পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হবিগঞ্জ জেলা শাখা।

# সাম্প্রদায়িক আক্রমণ, ধর্মীয়

করছে স্কুল কমিটি। কমিটির সভাপতি ফারুকুল ইসলামের বোন পারভীন আক্তারকে প্রধান শিক্ষক করতেই মূলত তাঁর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র।

২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর পাটগ্রামের বুড়িমারিতে শুধু একটা গুজবের ওপর ভর করে একদা শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, নিরীহ এবং কিছুটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শহিদুন্নবী জুয়েলকে দিনে দুপুরে সবার সামনে পিটিয়ে মারা হয়! পৈশাচিক উল্লাসে তার মৃতদেহ পোড়াল তারই ধর্মের লোকেরা। ২০১৬ সালে গুলশানের হলি আর্টিজানে ধর্মের নামে ২০ জন দেশী-বিদেশী নিরপরাধ মানুষের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে দেখুন। তার আগের দুই বছর ধরে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলো ইসলাম অবমাননার অভিযোগে পরিকল্পিতভাবে একের পর এক ব্লগার-লেখক-প্রকাশক-হিন্দু পুরোহিত-খ্রীস্টান পাদ্রী-বৌদ্ধ ভিক্ষু-সুফি-শিয়া-আহমদিয়া-বাহাই সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘুদের কুপিয়ে-জবাই করে খুন করে।

২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধদের বাড়িঘর ও বৌদ্ধবিহারে হামলার ঘটনা, ২০১৬ সালের ৩০শে অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে আক্রান্ত হিন্দু গ্রাম, ২০১৭ সালের ১০ই নভেম্বর রংপুরের গঙ্গাচড়াতে ফেসবুক থেকে ছড়ানো গুজবের জের ধরে এক জনের মৃত্যুসহ অসংখ্য ঘটনায় অভিযোগ সেই একই–হিন্দু বা সংখ্যালঘু তরুণের ফেসবুক থেকে নবীকে অবমাননার অভিযোগ। বিগত এক দশকে সারাদেশে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে শুধু ফেসবুকে ইসলাম অবমাননার অজুহাতে! প্রায় প্রতিটি ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং পুলিশ ও সরকারি প্রশাসন অতি সক্রিয় হয়ে 'আশু' বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনায় পরে প্রমাণিত হয়েছে যে কাউকে পরিকল্পিত উপায়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসানোর জন্য তার ফেসবুক হ্যাক করে ফটোশপকৃত ছবি বা উস্কানিমূলক বক্তব্য পোস্ট করা হয়েছিল।

গতবছর দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লার পূজামণ্ডপে কোরান রেখে দিয়ে অবমাননার অভিযোগ তুলে সারাদেশে পূজামণ্ডপ ও হিন্দুদের ওপর হামলা করা হয়। পরে উদঘাটিত হয়–দেবীমূর্তির পায়ের কাছে পরিকল্পিতভাবে কোরান রেখে এসেছে একজন মুসলিম। গত এক দশকে ঘটে যাওয়া এধরণের অসংখ্য সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের মামলায় ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে আমরা পাকিস্তানের প্রায় সমকক্ষ।

উল্টোদিকে বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্ম অবমাননার জন্য মামলা হয়েছে এমন ঘটনা বিরল। অনেকের কাছে সমীকরণ অত্যন্ত সহজ–মামলা যেহেতু হয় না, সুতরাং ধরে নিতে হবে তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অবমাননার কোনো ঘটনাও ঘটে না। বাস্তবেই কি পরিস্থিতি তা-ই? না কি, সংখ্যালঘু হওয়ায় আক্রমণের আশংকায় তাঁরা প্রতিবাদ করতে পারেন না?

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চর্চার পরিণতি : পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা

পাকিস্তানে গত মার্চ মাসে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খানে ধর্ম অবমাননার (ব্লাসফেমি) অভিযোগে এক স্কুল শিক্ষিকাকে হত্যার খবর পাওয়া গেছে। দেশটির একটি ধর্মীয় নারী বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে তাঁরই নারী সহকর্মী ও দুই শিক্ষার্থী হত্যা করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত দুই শিক্ষার্থী পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, তাঁদের এক আত্মীয় স্বপ্নে দেখেছেন-তাঁদের ওই শিক্ষিকা (সফুরা) নবী মুহাম্মদ সা.-এর বিরুদ্ধে 'নিন্দা করেছেন'। তাই তাঁরা তাকে হত্যা করেছে। এর আগে, গত বছর পাকিস্তানে কর্মরত এক শ্রীলঙ্কান নাগরিককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সাধারণ জনতা পিটিয়ে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ বছরের ৫ জুলাই পাকিস্তানের আদালত আশফাক মাসিহ নামের এক মেকানিককে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ২০১৭ সালের জুনে আশফাক লাহোরে এক ব্যক্তির মোটরবাইক সারিয়েছিলেন। অথচ তারপরে ওই ব্যক্তি তাঁকে পুরো টাকা দেননি। উল্টে তিনি দাবি করেন, ইসলাম ধর্ম সততার সঙ্গে পালন করেন তিনি। সেই কারণে তাঁকে ছাড় দেওয়া উচিত। আশফাক প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তিনি খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। ভিড় জমে যায়। উত্তেজিত জনতা মাসিহকে নবী মোহম্মদকে 'অসম্মান' করার অভিযোগ তোলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ আশফাককে গ্রেফতার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধেও ব্লাসফেমি(ধর্ম অবমাননা) মামলা দায়ের করে। এই উন্মত্ততা এমন যুক্তিহীন রূপ নিয়েছে যে, সম্প্রতি করাচিতে একটি শপিং মলে স্যামসাং কোম্পানির ওয়াইফাই ডিভাইসে দেয়া কিউআর কোডের মাধ্যমে আল্লাহ বা নবীর নাম বিকৃত করার হাস্যকর অভিযোগে ওই কোম্পানির ২৭ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

২০১৪ সালে লাহোরের ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণের গ্রাম কোট রাধাকিষানের উন্মত্ত জনতা কোরান অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে প্রথমে পদদলিত করে এবং পরে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে নিরীহ খ্রিস্টান দম্পতি শামা বিবি এবং শাহজাদ মসীহকে। এই অসহায় খ্রিস্টান দম্পতির দশ বছর বয়সি পুত্র সুলেমান এবং দুই বছরের কন্যাসন্তান পুনমকে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের নির্মম চিত্র দেখতে হয়েছে। শামা বিবি এবং শাহজাদ মসিহের রক্তঝরা আর্তনাদ পাকিস্তানে ধর্মের উন্মত্ততায় মানুষ হত্যা বন্ধ করতে পারেনি। কোট রাধাকিষান গ্রামের বর্বরতার ঠিক একমাস বারো দিন পর এই ধর্মের নামেই পাকিস্তানের পেশোয়ারে একটি স্কুলে জঙ্গি হামলা চালানো হয়। মুসলিম জঙ্গিদের বুলেট ১৩২জন নিরীহ স্কুলছাত্রসহ ১৪৯জন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। পেশোয়ারের আর্মি পাবলিক স্কুলে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড দুনিয়ার চতুর্থ ভয়াবহ স্কুল হত্যাকাণ্ড বলে চিহ্নিত হয়। অনেকে সেদিন প্রশ্ন করেছিল, স্কুলের এই নিরীহ বাচ্চাদের কি অপরাধ ছিল? তারা কি কোনো ধর্মের অবমাননা করেছিল?

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জরুরি

সাম্প্রতিককালে ফেসবুকে লেখায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে অনেকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা-গ্রেপ্তার-প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়ে না। জনগণকে বিভ্রান্ত করতে লোক দেখানো কিছু পদক্ষেপ নিলেও কোনও ঘটনারই যথার্থ বিচার শেষপর্যন্ত হয় না। ২০১২ সালে কক্সবাজারে বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিচার ও দোষীদের শাস্তি এখনো হয়নি, ২০১৬ সালে নাসিরনগরে হামলার ঘটনায়ও বিচার হয়নি। আইনের শাসনের অভাব ও বিচারহীনতার কারণে ক্রমাগত এই ধরণের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা বাড়ছে।

জনগণের ম্যাণ্ডেট ছাড়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শক্তি বলে দাবি করে। এদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ও নিরুপায় হয়ে সাধারণভাবে আওয়ামী লীগকেই ভোট দেয় ও সমর্থন করে। অথচ তাদের এই ১৩ বছরের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসনামলে হিন্দু-বৌদ্ধসহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অসংখ্য সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হয়েছে। কোনো ঘটনারই যথার্থ বিচার ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়নি, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিহত করতে প্রশাসনিক-রাজনৈতিক ও আদর্শগত-সাংস্কৃতিক উদ্যোগও শাসকদলের দেখা যায়নি। বরং সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক আক্রমণসহ বেশিরভাগ ঘটনায় অন্যান্যদের সাথে আওয়ামী-যুবলীগ-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও যুক্ত বলে সংবাদমাধ্যমে এসেছে। দমন-পীড়ন চালিয়ে সারাদেশকে বিরোধীদল শূন্য করে ফেলা হয়েছে, সমাজের সবক্ষেত্রে সরকারদলীয়দের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। ফলে, দেশে বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতার দায় আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে।

এখানেই শেষ নয়, আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের গণবিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনকে জায়েজ করতে একদিকে যেমন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ও 'উন্নয়ন'-এর বুলি আউড়াচ্ছে, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিতে 'ইসলামপসন্দ' সাজারও চেষ্টা করছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হেফাজতে ইসলামের সাথে আপোষ ও আঁতাত, পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন, ভাস্কর্য সরানো, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও বাজেট বৃদ্ধি, ওয়াজ মাহফিলের নামে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা, কওমী মাদ্রাসার সনদকে মাস্টার্সের সমমান দেয়া, ইসলামী জঙ্গীদের হাতে ব্লগার-লেখক-প্রকাশক হত্যার জন্য তাদের লেখালেখিকে দায়ী করা, সব উপজেলায় বিপুল ব্যয়ে মডেল মসজিদসহ ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠাসহ এর অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। ধর্মকে ব্যবহারের এই রাজনীতির প্রভাব এই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। যেকোন পন্থায় ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে আওয়ামী লীগ সরকার হেফাজতে ইসলাম, চরমোনাই পীরসহ মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাত ও আপোস করছে এবং নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

অন্যদিকে সমাজে মানুষের মধ্যে দিন দিন ধর্মান্ধতা, যুক্তিহীন আচরণ ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব বাড়ছে। দেশের শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রহীনতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতা সমাজমননেও প্রভাব ফেলছে। জাতীয় এই পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সুযোগ নিয়ে ইসলামী মৌলবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতা বাড়াচ্ছে। দেশে মূল্যবৃদ্ধি-ঘুষ-দুর্নীতি-স্বৈরশাসন-বেকারত্ব-দলীয়করণ-মানবাধিকার লঙ্ঘন-ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র হরণ ইত্যাদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদের সংগঠিত প্রতিবাদ তেমন দেখা যায় না। কিন্তু 'ইসলাম অবমাননা'কারীদের শাস্তি দিতে প্রায়ই 'তৌহিদী' জনতার নামে তারা মাঠে নামে। কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়, তাহলে তার নিন্দা-সমালোচনা করা যেতে পারে, প্রচলিত আইনে তার বিচারও হতে পারে। কেউ যদি ভুল বা অন্যায় কথাও বলে, তাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেয়া বা তার বাড়িঘরে হামলা করার অধিকার কারো নেই। একজন যদি 'অপরাধ' করেও থাকে এর জন্য তার সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো যায় না। কোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও সভ্য সমাজে এধরণের সম্প্রদায়গত শাস্তি চলতে পারে না। যেকোনো নাগরিকের নিরাপত্তা দেয়া সরকারের দায়িত্ব।

এধরণের হামলা সবসময় না হলেও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বৈষম্য-নিরাপত্তাহীনতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতির মধ্যেই বসবাস এদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের। উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা আজ আর বুর্জোয়াদের নেই। কারণ তারা সবাই দুর্নীতি-লুটপাট, সাধারণের সম্পত্তি আত্মসাৎ ও গণবিরোধী শাসনে লিপ্ত। ফলে ভোটের রাজনীতিতে জনগণের পশ্চাদপদ চিন্তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা ছাড়া তাদের আর পথ নেই। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে হলে–ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসানে ও জনজীবনের সমস্যা সমাধানে ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে শোষিত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে হবে এবং তার সাথে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিগত নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনকে মেলাতে হবে। এর সহযোগিতায় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সমাজের তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। সমাজে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা বিরাজ করছে, তা পূরণে উন্নততর আদর্শের ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তি এবং এই শক্তিকে প্রশ্রয়দানকারী শাসকদল আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমরা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রমনা মানুষকে এই লক্ষ্যে সংগঠিত হওয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাই।

# লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত

উচ্চমূল্যে তেল-এলএনজি আমদানি ছাড়া বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশের কি বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেল-এলএনজি আমদানি ছাড়া বিকল্প ছিল না? শুধুমাত্র ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলএনজি আমদানি বাবদ ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। (১/৮/২০২২ বণিক বার্তা) অথচ সে টাকার একটা অংশ দিয়েই স্থল ও সাগরের গ্যাস পরিকল্পনামাফিক উত্তোলন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত। সরকারের যুক্তি হচ্ছে, দেশে গ্যাসের উৎপাদন কমছে। প্রতিদিন ৩৭০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের চাহিদার বিপরীতে দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে ২২০-২৩০ কোটি ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যায়। বাকি জ্বালানির জন্য উচ্চমূল্যে তেল ও এলএনজি আমদানি ছাড়া উপায় ছিল না। এবং গ্যাসের মজুতও বেশিদিনের নেই। ফলে জনগণকে বিদ্যুৎ দিতেই সরকার এলএনজির উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে। আসুন, সরকারের এ যুক্তিগুলো যাচাই করে দেখি।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় যখন এলো, তখন বিদ্যুৎ ঘাটতি ছিল এক হাজার মেগাওয়াটের মতো। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের কথা বলে করা হলো 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি(বিশেষ বিধান), ২০১০' আইন। কোনো দরপত্র ও প্রয়োজনীয় সরকারী প্রক্রিয়া ছাড়া একের পর এক বেসরকারি উচ্চমূল্যের ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলভিত্তিক রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি করা হয়। সরকারঘনিষ্ঠ সামিট, ওরিয়নের মতো ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোর সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তিতে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ার বিধান রয়েছে। যে বিধানের বিশেষ দিক হলো, কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ কেনা হোক বা না হোক, বাধ্যতামূলকভাবে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। আর এই চার্জ চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। অথচ সেসময় তেল গ্যাস জাতীয় সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি বলেছিল, জনগণের মতামত উপেক্ষা করে মাত্র ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতে বছরে কুইক রেন্টাল খাতে ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাষ্ট্রায়ত্ত পুরনো বিদ্যুৎ প্লান্ট নবায়ন-মেরামত ও সম্প্রসারণ করলে, এসব প্লান্ট থেকে ১ হাজার ৫শত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। এজন্য উচ্চমূল্যের রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র দরকার নেই। কারণ তা ভবিষ্যতে অর্থনীতিতে বিরাট বিপদের কারণ হবে। বিদেশ থেকে বেশি দামে তেল এনে কম দামে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে দেওয়া, উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কেনা, ক্যাপাসিটি চার্জের ফলে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ ব্যবসায়ীদের পকেটে যাবে, বিদ্যুতের দাম বাড়বে এবং ভবিষ্যতে জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আর আজ তার ভয়াবহ ফলাফল আমরা প্রত্যক্ষ করছি। সেসময় জাতীয় কমিটি দেখিয়েছিল, ১৮টি কুইক রেন্টাল ও রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপিত ক্ষমতার তুলনায় উৎপাদন শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগ। ভর্তুকি মূল্যে ফার্নেস অয়েল-ডিজেল নিয়েও অল্প উৎপাদন করে শত শত কোটি টাকা লুটপাট করেছে, উৎপাদন না করেও ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে লুটপাটের কারণে সৃষ্ট লোকসানের ফলে, সরকার দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্য বাড়িয়েছে। গ্যাস উত্তোলনের কোনো ব্যবস্থা না নিয়েই হঠাৎ ২০১৫ সালে সরকারের পক্ষ থেকে বলা শুরু হয় যে গ্যাসের মজুত দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। যে গ্যাস আছে, তা দিয়ে আর ১৫ বছর চলবে। তার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এরপরই দেশী বিদেশী কোম্পানির সাথে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের চুক্তি, এলএনজি আমদানির তৎপরতা শুরু ও এলএনজি ভিত্তিক বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি হতে থাকে। ২০১৮ সাল থেকে এলএনজি আমদানি শুরু হয়। বর্তমানে গ্যাসের চাহিদার ২০ শতাংশ আমদানি করা এলএনজি দিয়ে পূরণ করা হচ্ছে। সরকারের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা ২০১৬-তেও, এলএনজি আমদানি বাড়িয়ে ২০২৩ সাল নাগাদ গ্যাসের চাহিদার ৪০ শতাংশ, ২০২৮ সাল নাগাদ ৫০ শতাংশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ গ্যাসের চাহিদার ৭০% বিদেশ থেকে আমদানি করা এলএনজি দিয়ে পূরণ করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এলএনজির দাম বিশ্ববাজারে অস্থিতিশীল হবে, এটা জানার পরও কেন, এলএনজি আমদানিতেই জোর দেওয়া হলো? আর মহাপরিকল্পনাতে এলএনজি আমদানিকেই প্রধান করে, এখন কেন দাম বেশি বলে এলএনজি আমদানি বন্ধ রাখা হচ্ছে?

গ্রীষ্মকালে এখন বিদ্যুতের চাহিদা সর্বোচ্চ ১৪-১৫ হাজার মেগাওয়াট আর শীতকালে চাহিদা নেমে আসে ৯-১০ হাজার মেগাওয়াটে। অথচ অপরিকল্পিতভাবে চাহিদার চেয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা ২২ হাজার ৩৪৮ মেগাওয়াট, যার প্রায় অর্ধেক বেসরকারি মালিকানার রেন্টাল-কুইকরেন্টাল ও আইপিপি মডেলের। অথচ এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়েছে ১৪ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট। ফলে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন ক্ষমতা বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান করা হয়েছে বছরের পর বছর ধরে, অন্যদিকে দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপাসিটি চার্জের নামে গত তিন বছর বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৫৪ হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের পকেটে গেছে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। গত এক দশকে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ জনগণের ৭০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে এলএনজি ও তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে আরও বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রাখা হচ্ছে, ফলে এদিকে ১২ বা ১৩ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন না হওয়ার কারণে লোডশেডিং এ জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে, কিন্তু ঠিকই ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়ে যেতে হচ্ছে। সংসদীয় কমিটির কাছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য অনুসারে, গত বছরের জুলাই থেকে গত মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে সরকার ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্র ভাড়া দিয়েছে প্রায় ১৬ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকদের কাছে গেছে প্রায় ১২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। বিদ্যুতের চাহিদা না থাকলেও, ভারতের আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করা করা হয় ২০১৭ সালে। শুধুমাত্র আদানিকে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ বছরে ৩ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা এবং প্লান্টের ২৫ বছর মেয়াদকালে ১ লাখ ৮ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আগস্টে বিদ্যুৎ আসার কথা থাকলেও, সঞ্চালন লাইন নির্মাণ না হওয়ায়, ডিসেম্বরের আগে সে বিদ্যুৎ আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপরও ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু চারমাসে বিদ্যুৎ ছাড়াই ভাড়া বাবদ আদানিকে দিতে হবে ১ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। আদানি থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য পিডিবি তার স্বাভাবিক 'মেরিট অর্ডার ডিসপ্যাচ' পদ্ধতি (কম খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কেন্দ্রগুলোকে আগে সুযোগ দেওয়া) অনুসরণ না করে 'প্রায়োরিটি-বেসড ডিসপ্যাচ' পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এ পদ্ধতিতে আমদানিকৃত বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রথমে দেশীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় রাখা হবে। এমনকি যদি তারা কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, তবু প্রাধান্য পাবে আমদানি।(৮/৬/২০২২, ডেইলি স্টার)। রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের লুটপাট, দুর্নীতি, ঋণ কেলেঙ্কারির বিচার দূরে থাকুক, তাদের একের পর এক সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে। ৩ বছরের কথা বলে রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি নবায়ন করে বাড়িয়ে ১৬ বছরে চলছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে ভোটারবিহীন সংসদে এগুলোর মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়ানোর বিল পাশ হয়েছে। আরো ভয়ংকর খবর হলো, এখন বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ব্যাংক থেকে ইচ্ছেমতো ঋণ নিতে পারবে, কোনো সীমা থাকবে না বলে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি আইন সংস্কার করেছে। একেই বলে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া!

এভাবেই দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থ ও মুনাফা নিশ্চিত রাখতে গিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকার দেশের বিদ্যুৎখাতকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে,দেশের অর্থনীতিকে সর্বনাশা খাদে ফেলেছে।

আমাদের দলসহ তেল গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটি, দেশপ্রেমিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন থেকেই এই কথাগুলো বলে আসছিলাম। স্থলভাগে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলন বাড়ানো, পুরনো ও পরিত্যক্ত গ্যাসকূপগুলো মেরামত, সংস্কার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিলে বর্তমান গ্যাসের ঘাটতির অনেকটাই মেটানো যেত। স্থল ও সাগরে যে বিশাল অনাবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র আছে, সেখানে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাপেক্সকে দিয়ে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর,বায়ু,পানি ইত্যাদি) উৎপাদন বাড়ালে, বিদেশ থেকে লক্ষ কোটি টাকার এলএনজি আমদানি বা পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কোনো প্রয়োজন হতো না। কিন্তু সরকার কোনো পরামর্শেই কান দেয়নি। কারণ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দেশীয় কোম্পানি বাপেক্সকে দিয়ে দেশের গ্যাস উত্তোলন করলে, মুনাফা ও কমিশন নাই। পকেট তো ভরবে আমদানি করলে, বেসরকারিকরণ করলে। এতে ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশী বিদেশী পুঁজিপতিগোষ্ঠীকে খুশি রাখা যায়।

সরকারের নিয়োগ করা আন্তর্জাতিক পরামর্শক কোম্পানি স্লামবার্জার দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উপর ২০১১ সালে সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষা করে তাদের প্রণীত 'গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরামর্শ'-তে দেওয়া সুপারিশও সরকার অনুসরণ করেনি। এতে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলো ওভারহোলিং-সংস্কার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময় নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানের পরামর্শ ছিল। সে রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রায় ১২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা) বিনিয়োগ করে বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রগুলোর কমপক্ষে ৪০টি কূপের ধারণক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং সেগুলো থেকে প্রতিদিন ৪০০-৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব। কিন্তু ১১ বছরে সরকার তাতে কান দেয়নি। (২৬/৪/২০২২, ডেইলি স্টার।)

ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত অথচ এখনও উত্তোলন করা হয়নি বা উত্তোলন স্থগিত আছে, সেগুলো জরুরি ভিত্তিতে উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ কয়েক বছর আগেই বিশেষজ্ঞরা রেখেছিলেন। যেমন–২০১৮ সালে আবিষ্কৃত ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্রটি অটুট পড়ে আছে। সেখানে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আছে, যা দিয়ে একবছরের চাহিদা মেটানো যায়। ভোলার অপর গ্যাসক্ষেত্র শাহবাজপুরে প্রায় ১.৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস থাকলেও, সেখান থেকে সক্ষমতার অর্ধেক উৎপাদন হচ্ছে। ভোলা দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে সংযোগ পাইপ তৈরি না করায়, এ গ্যাস পুরো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ আমরা দেখি, দেশেরই বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছে, সেখানে আদৌ কোনোদিন গ্যাস সরবরাহ করা যাবে কি না, তা মাথায় না রেখেই। পাইপলাইন না করার পেছনে সরকারের জ্বালানি মন্ত্রী ও পেট্রোবাংলার যুক্তি হচ্ছে, যে পরিমাণ গ্যাস আছে, তাতে পাইপলাইন অর্থনৈতিকভবে লাভজনক হবে না। অথচ একবছরে এলএনজি আমদানিতে লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা তাদের কাছে অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক হয় না! কথায় আছে, দুষ্ট লোকের ছলের অভাব হয় না! অথচ ২০০৩ সালে মার্কিন কোম্পানি ইউনিকল ভোলায় জরিপ চালিয়ে বলেছিলো, ভোলায় নতুন করে ৩-৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। ফলে পাইপলাইন বসালে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে কি না এ যুক্তি তুলে গ্যাস উত্তোলন বন্ধ রাখা, নিছক ছলমাত্র! সর্বশেষ ২০২১ সালে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাপেক্স অনুসন্ধান চালিয়ে ভোলায় আরো তিনটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বাপেক্সের কূপ খনন ও গ্যাস উত্তোলনের সক্ষমতা থাকলেও, বাপেক্সের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি খরচে কাজটি দেওয়া হয়েছে রাশিয়ান গ্যাজপ্রমকে। একইভাবে হবিগঞ্জে রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের ৯ নম্বর কূপটি ২০১৬ সাল থেকে উত্তোলনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এখনও সেটি চালু হয়নি, জরুরি পদক্ষেপ না নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বছরের পর বছর সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে।

২০২০ সালে আবিষ্কৃত সিলেটের জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস সরবরাহের কোনো জরুরি পরিকল্পনার কথা জানা যায়নি। ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের বড় আকারের প্রমাণিত মজুত থেকে মাত্র সামান্য গ্যাস তোলা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের পটিয়ায় ১৯৫৩ সালে গ্যাস পাওয়ার পরেও, সেসময় তুলনামূলক দুর্বল কারিগরি ব্যবস্থাপনায় গ্যাস উত্তোলন সম্ভব হয়নি। বর্তমানে উন্নত কারিগরি ব্যবস্থাপনায় সেখান থেকে গ্যাস উত্তোলন সম্ভব। এসব গ্যাসক্ষেত্র থেকে দ্রুত ও জরুরি ভিত্তিতে গ্যাস উত্তোলনের পদক্ষেপ নেওয়া হলে যে পরিমাণ গ্যাস এখনই সরবরাহের আওতায় আনা সম্ভব, তা দিয়ে এলএনজি আমদানির একটি বড় অংশ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব।

আশু স্বল্পমেয়াদী সমাধানের পাশাপাশি তেল গ্যাস রক্ষা কমিটি ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা জরুরি ভিত্তিতে স্থল ও সাগরে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন করে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বিনিয়োগের দাবি জানিয়েছিল। জ্বালানি বিভাগের অধীন হাইড্রোকার্বন ইউনিট (এইচসিইউ) ও নরওয়েজিয়ান পেট্রোলিয়াম ডিরেক্টরেট (এনপিডি) যৌথভাবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান গুস্তাভসন অ্যাসোসিয়েটসের মাধ্যমে ২০১০ সালে দেশের স্থলভাগ ও অগভীর সমুদ্রের গ্যাসের মজুদ নিয়ে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ, দেশে এমন অনাবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলোয় গ্যাস সম্পদের সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ৩৮ টিসিএফের কিছু বেশি। প্রতিবছর গ্যাসের ব্যবহার ১ টিসিএফ হিসেবে, ৩৮ বছরের সম্ভাব্য মজুদ ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার পর বহু বছর পার হয়ে গেলেও সমুদ্রসীমায় গ্যাসের মজুদ অনুসন্ধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা উত্তোলনের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। অথচ মায়ানমার ও ভারত তাদের সমুদ্রসীমায় গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন করছে বহুদিন ধরে। মালয়েশিয়ার তেল-গ্যাস কোম্পানি পেট্রোনাস এবং ভারতের ওএনজিসি কয়েক দশকে ব্যাপক সক্ষমতা অর্জন করেছে। বাপেক্সকে ভারতের ওএনজিসির মতো সক্ষম করবার কথা জাইকার তৈরি করা সরকারের পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানেও বলা হয়েছিল। মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা মতো এলএনজি আর কয়লা আমদানিনির্ভরতা বাড়ানো হয়েছে, এলএনজি আর কয়লা আমদানির টার্মিনাল তৈরি করা হয়েছে কিন্তু মাস্টার প্ল্যানেরই আরেকটি অংশে যেখানে বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল সেটা কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি! জাতীয় কমিটিসহ দেশের স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা বারবার বলেছেন, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদনে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি, আর তার জন্য চাই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশ। বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লা আর এলএনজির ওপর নির্ভর করে সস্তায় নির্ভরযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যায় না, ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জন করা যায় না। তেল, কয়লা বা এলএনজির দামের কোনো স্থিতিশীলতা থাকে না, এগুলোর সরবরাহের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না, পারমাণবিক বিদ্যুতের জ্বালানি ইউরেনিয়ামের জন্যও বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই আমদানি করা তেল-কয়লা-এলএনজি-ইউরেনিয়ামভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে হাজার হাজার মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি হয়তো বাড়ানো যায়, কিন্তু তার মাধ্যমে সস্তায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া রামপাল, রূপপুরসহ কয়লাভিত্তিক ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ দেশের জন্য ভয়াবহ, আর্থিক ও পরিবেশগত দিক থেকে হুমকিস্বরূপ বিধায় সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

দেশীয় কর্তৃত্বে পদ্মা সেতু নির্মাণের কথা আমরা সবাই জানি। দেশের স্থলভাগ ও সাগরের গ্যাস উত্তোলনের জন্যও কিন্তু একই মডেলের কথা বলা হচ্ছে বহু বছর ধরে। পদ্মা সেতুর মতো জটিল ও ব্যয়বহুল সেতু নির্মাণের অভিজ্ঞতাও আগে বাংলাদেশের ছিল না কিন্তু দেশি-বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ। তেল-গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিটির কথা আমরা বলছি বহু বছর ধরে। সাগরের তেল-গ্যাস উত্তোলনে বাংলাদেশের নিজস্ব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নেই, স্থলভাগে আছে। কিন্তু যাদের সাগরে গ্যাস উত্তোলনে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করে সাগরের গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ নিলে পদ্মা সেতুর চেয়ে বহুগুণ কম খরচে মূল্যবান গ্যাস উত্তোলন করা যেত।

উপরের আলোচনাতেই স্পষ্ট, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফা ও লুটপাটের স্বার্থে কীভাবে বিদ্যুৎখাতের বর্তমান সংকট সৃষ্টি করেছে এবং তার বোঝা চাপাচ্ছে দেশের অর্থনীতি ও জনগণের কাঁধে। এর ফলাফল হিসেবে, বিদ্যুতের দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফলে বিদ্যুৎখাতে লুটপাটের সাথে জড়িতদের বিচার ও শাস্তি, অবিলম্বে রেন্টাল-কুইকরেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি বাতিল, ব্যয়বহুল-আমদানি নির্ভর-পরিবেশ বিধ্বংসী জ্বালানি নীতি বাতিল করে স্বনির্ভর, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবিতে আজ জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একইসাথে আজকের এ সংকটের জন্য দায়ী আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটাতে সকল বাম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

# জ্বালানি খাতের

**নিয়ে যাতে প্রশ্ন করা, আইনি ব্যবস্থা না নেয়া যায়, সেজন্য দায়মুক্তি আইন করা হয়েছে।**

**সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিটির ঢাকা মহানগর নেতা জুলফিকার আলী। বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির অন্যতম সংগঠক অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, রুহিন হোসেন প্রিন্স, বজলুর রশীদ ফিরোজ, সাইফুল হক, বাচ্চু ভূঁইয়া, নাঈমা খালেক মনিকা, শহিদুল ইসলাম সবুজ, আব্দুল আলী, মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন, শামসুল আলম, মীর রেজাউল আলম, সদরুল হাসান রিপন, বিধান চন্দ্র দাস, মাসুদ খান প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন জাতীয় কমিটির ঢাকা মহানগর সমন্বয়কারী খান আসাদুজ্জামান খান মাসুম। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।**

# ন্যূনতম মজুরি ২০

মিয়া প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, “চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলছে। অথচ গার্মেন্টসসহ সর্বস্তরের শ্রমিকদের জীবনধারণের প্রয়োজনে ন্যূনতম মজুরির দাবি উপেক্ষিত। সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি শ্রমিকেরা মরিয়া হয়ে আন্দোলনের পথে পা বাড়ালে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে মালিকশ্রেণির পক্ষাবলম্বনে এগিয়ে আসেন। রাষ্ট্র ও সরকারের মালিকী শোষণের পাহারাদার হিসেবে ভূমিকা পালনের ঘটনা উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।”

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, “পাটকল-চিনিকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের আজ কাজের নিশ্চয়তা নেই। কাজের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নেই, আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, নেই স্থায়ী কোনো কর্মঘণ্টা, বাধ্যতামূলক শ্রম, ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন কর্মস্থল, ছাঁটাই-নির্যাতন ইত্যাদিতে ভয়াবহ শ্রম পরিবেশ বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদানসহ বাঁচার দাবিতে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।”

নেতৃবৃন্দ ব্যাটারিচালিত অটো রিকশা-ভ্যান চলাচলে সরকারদলীয় মাস্তানদের চাঁদাবাজি ও পুলিশি হয়রানি বন্ধ করে অবিলম্বে সরকার ঘোষিত লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদানের জোর দাবি জানান।

সমাবেশের পূর্বে শ্রমিকদের লাল পতাকা মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

# সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা
আগস্ট-২০২২


# জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি এবং সিলেটের বন্যা

জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি এবং সিলেটের বন্যা সিলেট অঞ্চলে এবারের বন্যার তান্ডব অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। মূলত জুন মাসের মাঝামাঝি সময়েই সিলেটের ৮০ শতাংশ অঞ্চল বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। শুধু সিলেট অঞ্চল নয়; ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রামসহ দেশের প্রায় ১৪টি জেলার মানুষ এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সিলেট অঞ্চল সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

সরকারের তরফে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী জনগণকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে–বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার প্রস্তুত! কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রস্তুতির নামে আমরা দেখলাম বন্যার্ত মানুষদের প্রতি উদাসীনতা এবং বহু ক্ষেত্রে নির্মমতা।

**ডুবলো বাড়িঘর, ভাসলো মানুষ**

শুরুতেই বন্যার পানিতে ঘর-বাড়ি ডুবে যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অসহায় মানুষ আশ্রয় নেয় টিনের চালে, গাছের ডালে। কেউ কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে, স্কুল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে। মায়ের কোল থেকে সন্তান বানের পানিতে ভেসে গেছে। অনেকেরই আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার মতো বাস্তব অবস্থাই ছিল না। মানবিক বিপর্যয় চরম আকার ধারণ করে। এসময় প্রাথমিক কাজ ছিল উদ্ধার তৎপরতা জোরদার করা। কিন্তু ছিল না যথেষ্ট জলযান, নৌকা কিংবা স্পিডবোট। সেনাবাহিনী উদ্ধার তৎপরতায় স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করেনি। এটা জনবিচ্ছিন্নতাকেই নির্দেশ করে। আমাদের দেশে বন্যা পরিস্থিতি বিরলও নয়, অস্বাভাবিক নয়। তাহলে বিভিন্ন বাহিনীর পর্যাপ্ত প্রস্তুতি এবং জলযানের অভাব কেন? সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগেরই ব্যবস্থাপনা খুবই নাজুক। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলো মানুষে-পশুতে একাকার অবস্থা। খাদ্য নেই–সুপেয় পানি নেই। চারিদিকে শুধু হাহাকার। দূর থেকে কোনো নৌকা দেখলেই একটু খাবারের জন্য মানুষ হুড়োহুড়ি করেছে। ছোট-ছোট বাচ্চাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়! সরকার মানুষের জীবনের সামান্যটুকু মূল্য দিলে আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে বিপর্যয়ের ধাক্কা অনেকটা কমাতে পারত।

**জলবায়ু পরিবর্তন, অতিবৃষ্টি এবং সিলেটের বন্যা**

এবারের বন্যা পুরোটাই প্রাকৃতিক নয়; অনেকটা মনুষ্যসৃষ্ট। একথা ঠিক, বাংলাদেশের উজানে ভারতের আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় এবার প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঢলের এই বিপুল পরিমাণ পানি ভাটি অঞ্চল অর্থাৎ সিলেট এবং এর পাশ্ববর্তী অঞ্চলের ছড়া, নদী, হাওর হয়ে সমুদ্রে পড়বে,তাই স্বাভাবিক। এখানেই সমস্যা। সিলেটের সুরমা এবং কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। ভরাট হয়ে গেছে নদীর উৎসমুখ; সেখানে ৩২ কিলোমিটারে জেগেছে ৩৫টি চর। নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়েছে অথচ খননের উদ্যোগ নেই।

সিলেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ছিল ২৫-৩০টি প্রাকৃতিক খাল যা ছড়া নামে পরিচিত। এগুলো পানি নিষ্কাশনে ভূমিকা রাখত। বর্তমানে প্রায় সবগুলো ছড়া

● ৬ এর পাতায় দেখুন

ঢাকাসহ দেশব্যাপী জাতীয় কমিটির মিছিল-সমাবেশ

## জ্বালানি খাতের দায়মুক্তি আইন বাতিল, ভুল নীতি ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি

জ্বালানি খাতের দায়মুক্তি আইন বাতিল, ভুল নীতি ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি জাতীয় কমিটির বিদ্যুৎ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ও সংকটের জন্য দায়ীদের শাস্তির দাবিতে গত ২১ জুলাই ২০২২ জাতীয় প্রেসক্লাবে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ঢাকা নগরের উদ্যোগে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে যথাযথ ভূমিকা না নিয়ে, কমিশন এজেন্ট ও কর্তৃক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুযোগ দিতে আমদানি নির্ভর জ্বালানি নীতির ফলে দেশের বিদ্যুৎ খাত সংকটে পড়েছে। সরকারের ভুল নীতি ও দুর্নীতির দায় জনগণ নেবে না। জনগণের টাকা খরচ করা হবে অথচ ওই টাকা খরচ

● ৭ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত

# ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ও সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু কর

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মালিকানা নির্বিশেষে জাতীয় মজুরি ২০ হাজার টাকা ও সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবি জানিয়েছেন।

২৯ জুলাই ২০২২ বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানিয়েছেন। সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য ভজন বিশ্বাস। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) ঢাকা নগরের ইনচার্জ নাইমা খালেদ মনিকা, সংগঠনের সদস্য শহিদুল ইসলাম, পাটকল শ্রমিক নেতা মো. গোফরান, দর্জি শ্রমিক নেতা কালাম মিয়া, অটোরিকশা শ্রমিক বাদশা

● ৭ এর পাতায় দেখুন

## সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সাংস্কৃতিক সমাবেশ

নড়াইলে সাম্প্রদায়িক হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর উদ্যোগে গত ২৬ জুলাই ২০২২ বিকাল ৪টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সাংস্কৃতিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চারণের সদস্যরা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একক ও দলীয় গান, আবৃত্তি পরিবেশন

● ৬ এর পাতায় দেখুন

## হবিগঞ্জে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের আঞ্চলিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

কমরেড শিবদাস ঘোষের "শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?" এবং "শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার ও করণীয়" শীর্ষক বক্তব্য নিয়ে ২৩ জুলাই ২০২২ হবিগঞ্জ জেলা শহরের সুরবিতান মিলনায়তনে দুই পর্বে দিনব্যাপী আঞ্চলিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষাশিবিরে প্রধান আলোচক ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড উজ্জ্বল রায়।

"শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার

● ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক-কৃষি বাঁচাতে ও দেশের খাদ্যনিরাপত্তার স্বার্থে

## ইউরিয়া সারের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার কর

*বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন*

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল ও সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হাবিব সাঈদ ৩ আগস্ট সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত বিবৃতিতে ইউরিয়া সারের কেজি প্রতি ৬ টাকা মূল্যবৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং কৃষক-কৃষি ও দেশবাসীর খাদ্যনিরাপত্তার স্বার্থে এই বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তাঁরা বলেন–"সরকার

● ২ এর পাতায় দেখুন

## হাওরে অপরিকল্পিত সড়ক-বাঁধ ও উন্নয়নের নামে প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী সকল প্রকল্প বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২০ জুন ২০২২ বিকাল ৪ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের উদ্যোগে বন্যা দুর্গত সিলেট-সুনামগঞ্জ, উত্তরবঙ্গের জেলাসহ সকল জেলাতে পানিবন্দি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ, হাওরে অপরিকল্পিত সড়ক-বাঁধ ও উন্নয়নের নামে প্রাণ প্রকৃতি ধ্বংসকারী সকল প্রকল্প বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের

● ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–২২৩৩৫৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org